মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র

নানাদেশীয় সাহিত্য, কাব্য, ইতিহাস, হস্তলিখিত পুঁথী এবং প্রচলিত
কিম্বদন্তী মূলক মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও তদীয় বংশাবলীর
ও পার্শ্বদগণের বিবরণ সম্বলিত তাৎকালিক
বাঙ্গলার আলেখ্য

নদীয়া কাহিনী, শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীচৈতন্য, চাঁদমুখ, হজরত মহম্মদ,
সতীদাহ প্রভৃতি লেখক
রায় শ্রীকুমুদ নাথ মল্লিক বাহাদুর
সঙ্কলিত

সন ১৩৩০ বঙ্গাব্দ

শ্রীনৃপেন্দ্র নাথ মল্লিক
রাণাঘাট
কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

লণ্ডন প্রেস
কলিকাতা, ১৩০ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট
শ্রীবলাই চন্দ্র দাস দ্বারা
মুদ্রিত

মূল্য এক টাকা

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক

নদীয়া-কাহিনী,——প্রাচীন ও আধুনিক নদীয়ার অপূর্ব্ব বৃত্তান্ত, বাঅট্টিখানি হাপটোন চিত্র, মূল্য কাপড়ে ২।০ ও কাগজে বাঁধা ২, টাকা মাত্র।

শ্রীগৌরাঙ্গ——কলিপাবন, পতিততারণ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পূত লীলা কথা বহু চিত্র খচিত মূল্য ।০ আনা।

শ্রীচৈতন্য,—সহজ সরল কথায় সংক্ষেপে শ্রীচৈতন্য চরিতাখ্যান, প্রাণ ভোলান মন-মাতান বহু রঙ্গিন ছবি, মূল্য ।৵০ আনা।

চাঁদমুখ,— ছেলেদের ছবি, গল্প ও হাসির অফুরন্ত ভাণ্ডার, চকচকে কাগজে ঝকঝকে ছাপা, মূল্য ।০ আনা।

হজরত মহম্মদ,— মহাপুরুষ হজরতের হজরতের অমৃতময়ী কাহিনী, মূল্য ॥০ আনা।

সতীদাহ,—বৈদিক যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত যত সতীদাহ হইয়াছে তাহার বহু ঘটনা ইহাতে বর্ণিত ও সতীদাহের সম্পূর্ণ ইতিহাস ইহাতে দেখিতে পাইবেন, সুন্দর ছবি মূল্য ১, টাকা মাত্র।

প্রকাশকের নিবেদন

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র, বহুদিন লিখিত হইলেও নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় এতদিন ইহা প্রকাশে মন দিতে পারি নাই। যখন নূতন প্রেসের সুযোগ্য অধ্যক্ষ আমাদের পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান জীবানন্দ মল্লিক মহাশয় মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত করিলেন তখন ইহা মাত্র ছাপাখানায় দেওয়া হইয়াছে। পরে যখন ঐ বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া বহু সহৃদয় পাঠক পত্রের দ্বারা বা স্বয়ং আসিয়া শ্রীমান জীবানন্দকে পুস্তক প্রাপ্তির জন্য ব্যস্ত করিয়া তুলিলেন, তখন তাঁহার ও কল্যাণীয় শ্রীমান শচীন্দ্রনাথের আগ্রহে পুস্তক খানি একদিনে ছাপিতে হয়; সুতরাং ইহার প্রতি পৃষ্ঠায় বহু মুদ্রাকর প্রমাদ ও ভ্রমভ্রান্তি রহিয়া গিয়াছে, সেজন্য সহৃদয় পাঠকগণের নিকট আমি ক্ষুব্ধ হৃদয়ে ত্রুটি স্বীকার করিতেছি ও প্রার্থনা করিতেছি যে তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক অবস্থা বিবেচনায় আমাদের সেই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া বাধিত করিবেন।

পঞ্চমী;
রাণাঘাট। } শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ মল্লিক

এ বিশ্ব সৃষ্টি প্রভু লীলা পুষ্টি করিতে তোমার ; যাকে যা' করাও প্রভু স্মরণ, মনন, কিম্বা কার্য্যকরণ, সকলই তব লীলা ওহে নারায়ণ। আমি জীব কর্ম্মে মাত্র অধিকার মোর, ফলে প্রভু নাহি অধিকার ; এ ক্ষুদ্র কর্ম্মের যদি কিছু মাত্র থাকে ফল নারায়ণ। পদে তব করিনু অর্পণ—তব পদ পূজা যোগ্য যদিও এ নহে তবু তোমারি এ দান, ভক্তাধীন তুমি ভগবান পদে দিও স্থান। তুমি জগন্নাথ জগতই তোমার, তোমাকে কি দিব নাথ সবই যে তোমার—তবে তুমি দীন শরণ, এ দীন মনন পূর্ণ কর দিয়া শ্রীচরণ।

নিবেদন

শ্রীশ্রীনারায়ণের কৃপায় আজ বহুদিনের অভীপ্সিত মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের চরিতাখ্যান প্রকাশিত হইল। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের চরিতাখ্যান বাঙ্গালীর কাছে নানা কারণে প্রিয় কেন না তিনি যে সময়ে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন সেই সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা দেশ ও তথা বাঙ্গালী জাতির শিক্ষা, দীক্ষা, সংস্কার, সাধনা, আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, ঘর, সংসার, অন্দর, বাহির, বেশ, ভূষা, চাল চলন ভাবভঙ্গী, কথাবার্ত্তা, হাসি, কৌতুক, রাজ নীতি ও সমাজ নীতি সব বিষয়েই সর্ব্বতোভাবে পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়া এখন পূর্ব্ব ভাবের শেষ চিহ্ন টুকুও লোপ পাইতে বসিয়াছে। পাশ্চত্য ভাব ভাষা প্লাবিত বর্ত্তমান বাঙ্গলা তাই কৃষ্ণচন্দ্রের জনশ্রুতিমূলক আখ্যান "সেকালের" কথা বলিয়া যখন তখন যেখানে সেখানে গল্প করে ও শুনে এবং মনে মনে কখন হর্ষ হয় কখন সে দিনের জন্য হা হুতাশ করে। পরিবর্ত্তনই সেকাল ও একালের সৃষ্টিকর্ত্তা; মাত্র কিঞ্চিদধিক দেড় শত বৎসরের কথা হইলেও সর্ব্ব বিষয়ে এমনি পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে যে কালের হিসাবে সে সব কাহিনী সে দিনের কথা হইলেও উহা যেন কোন অতীত যুগের গল্প কথা বলিয়া বোধ হয়। বাল্যকালে আমার পিতৃদেবের পার্শ্বচর বৃদ্ধগণের মুখে কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ের নানা গল্প শুনিয়া তাঁহার সম্বন্ধে আরও অধিক কথা জানিবার জন্য আবাল্য প্রাণে একটা আকাঙ্খার সৃষ্টি হয়। শ্রীশ্রীভগবানের কৃপায় সেই আকাঙ্ক্ষা এতদিনে কথঞ্চিত মিটিল তার তাই একা সে রসাস্বাদ না করিয়া আমার মত আর যদি কেহ কৃষ্ণচন্দ্র চরিতাখ্যান জানিতে ইচ্ছুক থাকেন তবে তাঁহাহাদের অবগতির জন্য আমার এই ক্ষুদ্র আয়াস সাধারণে প্রকাশ করিলাম এই পুস্তক রচনায় আমি মৎ প্রণীত নদীয়া কাহিনীর সবিশেষ সাহায্য লইয়াছি, এমন কি বহুস্থানে তাহার ভাষাও যথাবৎ উদ্ধৃত করিয়াছি। নদীয়া কাহিনী রচনায় যে যে পুস্তক হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলাম এই পুস্তক সঙ্কলনেও সে সকল গ্রন্থের সাহায্য লইতে

য়াছে। যে অংশ যাহা হইতে গৃহীত তাহা যথাস্থানে উল্লেখ করিয়াছি এবং আমি কোনও বিষয়ে নিজের অভিমত ব্যক্ত করি নাই। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র সম্বন্ধে যেখানে যে কথাটী পাইয়াছি তাহাই পুস্তক মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। নিরপেক্ষ পাঠক তাহা পাঠে নিজ নিজ মতামত গঠন করিবেন। প্রথমে এই আখ্যায়িকার পুরোভাগে নদীয়া রাজ বংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছি। কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনে তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষের প্রভাব কিরূপ বিস্তার লাভ করিয়াছিল তাহা এই পরিচ্ছেদ হইতে জানা যাইবে। পরে কৃষ্ণচন্দ্রের চরিতাখ্যান বর্ণনা করিয়াছি। ইহার মূলে ইতিহাস ও কিম্বদন্তী দুইই আছে তবে সুখের বিষয় অধিকাংশ স্থলেই কিম্বদন্তীর সাথে ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রত্যক্ষদর্শী বঙ্গ কবি কুলরবি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল গ্রন্থে নদীয়া রাজবংশের ও কৃষ্ণচন্দ্রের সম্বন্ধে অনেক কথা পাওয়া যায়। পরের অধ্যায়ে কৃষ্ণচন্দ্রের প্রধান প্রধান কতিপয় সভাসদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া শেষ অধ্যায়ে বাঙ্গলার সমাজের উপর কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগের প্রভাব বর্ণনা করিয়াছি।

পরিশিষ্টে বংশাবলি ও অন্যান্য কথা সন্নিবেশ করিয়াছি।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন ও বৈষয়িক নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় যে একাগ্রতার সহিত ইহা সম্পন্ন হওয়া উচিত ছিল তাহা যে হইয়াছে ইহা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি না। সুতরাং তৎপরতার আনুসঙ্গিক বহু ত্রুটি ইহার প্রতি অঙ্গে লক্ষিত হইতে পারে। সহৃদয় পাঠকের নিকট সবিনয় নিবেদন যে তদ্রূপ কোনও দোষ বা ত্রুটি গোচরীভূত হইলে ও তাহা আমাকে জানাইলে আমি তাঁহাদিগের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞ থাকিব ও ভবিষ্যৎ সংস্করণে উহা সংশোধনের চেষ্টা করিব।

রাণাঘাট
ভাদ্র, শুক্ল একাদশী
১৩৩০ সাল। — শ্রীকুমুদ নাথ মল্লিক

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র

সূর্য্যকরোজ্জ্বলা শৈল কিরিটিনী সাগর কুন্তলা সুজলা সুফলা বাঙ্গলা যে কেবল শস্য শ্যামলা বলিয়া গরবিণী তাহা নহেন, তাঁহার স্নেহময় ক্রোড়ে কত মনীষি কত মহাপুরুষ, কত ভাগ্যবান কত বিদ্বান প্রাদুর্ভূত হইয়া মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই।

যে সকল মহাপুরুষ বাঙ্গলা দেশে, বাঙ্গালী জাতির মধ্যে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া আপনাদের অনন্যসাধারণ গুণে ও মহান চরিত্র বলে মহাকালের পাষাণময় বক্ষে সুচারু-রেখাঙ্কন করিয়া গিয়াছেন নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম।

নদীয়ার রাজাগণ মহারাজা আদিশূর আনীত বিশ্রুত যশা পঞ্চব্রাহ্মণের * নেতা ব্রহ্মরাজর্ষি ভট্টনারায়ণের বংশোদ্ভূত। ভট্টনারায়ণ কান্যকুব্জ প্রদেশের ক্ষিতীশ † নামক রাজার পুত্র। ভট্টনারায়ণের পুত্রসংখ্যা যোড়শ; তাঁহারা সকলে পণ্ডিত ও ধার্ম্মিক বলিয়া খ্যাত। তাঁহার চতুর্থ পুত্র নিপ হইতে অধঃস্তন একাদশ পুরুষে ‡ মহাত্মা কামদেব জন্মগ্রহণ করেন।

---

* কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণ—শ্রীহর্ষ, ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, বেদগর্ভ ও ছান্দড়।

† ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতম।

‡ ভট্টনারায়ণ, নিপ, হলায়ুধ, হরিহর, কন্দর্প, বিশ্বম্ভর, নরহরি, নারায়ণ, ধর্ম্মাঙ্গদ, তারাপতি, কামদেব, (১৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দ)।

সর্ব্বশুদ্ধ ইঁহাদের বিষয় ভোগকাল তিন শত বাইশ বৎসর। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোনও ঘটনা সংঘটিত হয় নাই। ইঁহারা সকলেই বিদ্বান, ধর্ম্মভীরু, আচার ও নিষ্ঠাবান এবং সৎক্রিয়ান্বিত ছিলেন!

কামদেবের চারিপুত্র; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ বিশ্বনাথ পিতৃগদী প্রাপ্ত হইলে তাঁহার সহোদরগণ নানারূপে বিবাদের সৃষ্টি করেন বিশ্বনাথ বিবাদ নিষ্পত্তি মানসে চতুর্দ্দশ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লী যাত্রা করেন, এবং স্বীয় অসাধারণ বিদ্যাবত্তাগুণে মহামান্য দিল্লী দরবার হইতে রাজোপাধি এবং পৈতৃক অধিকার ব্যতীত নির্দ্দিষ্ট করধার্য্যে আরও অনেক গুলি গ্রাম খেলায়েৎ প্রাপ্ত হয়েন। বিশ্বনাথ সর্ব্ববিষয়ে নিজের বিস্তীর্ণ সম্পত্তির উন্নতি করিয়া যান। তিনি বৃদ্ধ বয়সে পরগণা কাঁকালী ও অন্যান্য ভূসম্পত্তি ক্রয় করেন।

কামদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার অধঃস্তন সপ্তম পুরুষে * কাশীনাথ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি অসাধারণ বীর ও অতিশয় বুদ্ধিমান হইলেও চক্রান্তে পড়িয়া যৎপরোনাস্তি কষ্ট প্রাপ্ত হয়েন এবং তদানীন্তন জাহাঙ্গীরের সুবার কুদৃষ্টিতে পড়িয়া তাঁহারই প্ররোচনায় তাৎকালিক দিল্লীশ্বর কর্ত্তৃক রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া পরিশেষে ঘাতক হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হয়েন। কথিত আছে † তদানীন্তন ত্রিপুরাধিপতির নিকট হইতে দিল্লীশ্বরের নিকট কতকগুলি হস্তী প্রেরিত হয় সেই সকল হস্তীর মধ্যে একটী মহাগজ, পথিমধ্যে যূথভ্রষ্ট হইয়া কাশীনাথের অধিকার মধ্যে মহা উপদ্রব করিতে থাকে। মহাবীর কাশীনাথ হস্তী কর্ত্তৃক তাঁহার প্রজাবর্গের দুরবস্থার কথা শুনিয়া স্বয়ং যাইয়া ঐ হস্তীকে বধ করেন। ঐ সূত্রে তাঁহার চির বৈরী ঢাকার সুবা এই ঘটনা অতি

---

* কামদেব, রামচন্দ্র, সুবুদ্ধি, ত্রিলোচন, হরিদাস, কাশীনাথ, ১৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মোট কামদেব পর হইতে ১৯৮ বৎসর রাজ্যভোগ কাল।

† ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতম্।

রঞ্জিত করিয়া দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে কাশীনাথের রাজ্যনাশ ও তাঁহার নিধনের আদেশ লইয়া কাশীনাথের বিরুদ্ধে বহুসৈন্য প্রেরণ করেন। কাশীনাথ বিভব সম্পন্ন হইলেও দেশের রাজার তুলনায় একজন সামন্ত ভূস্বামী মাত্র সুতরাং চরমুখে এই অপ্রত্যাশিত দুঃসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া নিজ জীবন ও বংশ রক্ষার্থ স্বীয় গর্ভবতী সহধর্ম্মিণী ও একজন বিশ্বস্ত অনুচর সঙ্গে গোপনে গৃহত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করেন। অনন্তর বহুপথ অতিক্রম করিয়া নদীয়ার সন্নিহিত বাগোয়ান পরগনান্তর্গত আন্দুলিয়া নামক গ্রামের তলবাহিনী নদী পার হইয়া খেয়ার মাঝীকে তাহার তৎপরতার পুরস্কার স্বরূপ একটী অঙ্গুরী প্রদান করেন। তাঁহার অনুসরণকারী সুবার গুপ্তচরগণও তাহার অনুসন্ধানে এই স্থানে আসিয়া নদী পার কালে দরিদ্র মাঝীর হাতে ঐ মহা-মূল্য অঙ্গুরীয়ক দেখিয়া তথ্যানুসন্ধানে ঐ মাঝীর সাহায্যে কাশীনাথের সন্ধান করিতে সক্ষম হয়। কাশীনাথ তখন নদীতে স্নান করিয়া জপে নিযুক্ত ছিলেন; দুরাত্মাগণ তদবস্থাতেই তাঁহাকে নিহত করে।

এই বিপত্তিকালে তাঁহার অনাথিনী গর্ভবতী স্ত্রী একজন বিশ্বস্ত অনুচর ও একশত স্বর্ণ মুদ্রা সহিত পলায়ন পূর্ব্বক তত্রস্থ ব্রাহ্মণ ভূস্বামী মহাত্মা হরেকৃষ্ণ সমাদ্দারের বাটীতে যাইয়া লুক্কায়িত থাকেন। সমাদ্দার সবিশেষ অবগত হইয়া আপন কন্যার মত আদর স্নেহে এই অনাথিনীকে আশ্রয় দান করেন। এখানে শীঘ্রই তাঁহার একটী সুকুমার ভূমিষ্ঠ হয়েন। এই পুত্রের নাম রামচন্দ্র। হরেকৃষ্ণ সমাদ্দার নিঃসন্তান ছিলেন সুতরাং মৃত্যু কালে তিনি পালিত পুত্র রামচন্দ্রকেই তাঁহার বংশের উপাধি সহ তাঁহার ক্ষুদ্র জমিদারী পাটকাবারি ও বাগোয়ান প্রভৃতির অধিকারী করিয়া যান। তদবধি রামচন্দ্র রাম সমাদ্দার নামে খ্যাত হয়েন।

তাঁহার পত্নীর নাম সীতাদেবী, ইহার গর্ভে রামচন্দ্রের দুর্গাদাস, জগদীশ, হরিবল্লভ ও সুবুদ্ধি নামে চারিটী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

এই দুর্গাদাসই পরে "ভবানন্দ মজুমদার" নামে খ্যাত হয়েন। দুর্গাদাস বাল্যকাল হইতেই অতিশয় বুদ্ধিমান ছিলেন কথিত আছে তাঁহার বয়স যখন একাদশ বর্ষ তখন একদিন তিনি তাঁহার বাল্য সহচরগণের সহিত গ্রামতলবাহিনী নদীতীরে যখন খেলা করিতে ছিলেন তখন ঢাকা হইতে নব নিযুক্ত হুগলীর ফৌজদার এই পথে যাইতে তাঁহাকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে হুগলীর পথ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ পার্শ্ববর্ত্তী ধীবর ও নৌকাবাহীগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া উক্ত ফৌজদার সাহেবকে পথের বিষয় উত্তমরূপে বুঝাইয়া দেন কিন্তু তাঁহার সহচর বালকগণ ফৌজদারের আগমনে ভয়ে সে স্থান ত্যাগ করে। গুণগ্রাহী ফৌজদার এতদ্ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া ও দুর্গাদাসের নির্ভীক ভাব ও সুন্দর গঠন ও বাক্য চাতুরী অবলোকন করিয়া তাঁহার উপর সবিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে তাঁহার আত্মীয় স্বজনের মত করাইয়া তাঁহার জন্য আরবী ও পার্শী শিক্ষার ব্যবস্থা করেন এবং ভবানন্দ ঐ ভাষায় পারদর্শীতা লাভ করিলে তাঁহাকে ঢাকার সুবার সম্মতি লইয়া সসম্মানে হুগলীর কানুনগুই পদে নিযুক্ত করেন। তদবধি তিনি ভবানন্দ মজুমদার নামে খ্যাত হয়েন।

এই কালে তিনি আন্দুলিয়া ব্যতিত তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা বল্লভের স্থাপিত বল্লভ পুরে একটী বাটী নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার অপর তিন সহোদর হরিবল্লভ, জগদীশ ও সুবুদ্ধিও যথাক্রমে ফতেপুর, কুড়ালগাছি ও পাটিকেবাড়ীতে পুরী নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বাস করিতে থাকেন। ভবানন্দ বল্লভপুরে পুরী নির্ম্মাণ করিলেন বটে কিন্তু সেখানে কদাচ বাস করিয়াছিলেন। তিনি পিতামাতার সহিত আন্দুলিয়াতে এ সময় বাস করিতেন এবং এখানেই গৃহদেবতা গোবিন্দ দেবের সেবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

উত্তর কালে কিরূপে ভবানন্দ, বঙ্গের স্বাধীন বাঙ্গালী ভূপতি প্রতাপের খুল্লতাত পুত্র কচু রায় ও চাঁচড়া রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ মহাতাপ রামরায়ের

সাহায্যে প্রতাপের রাজধানী প্রবেশের গুপ্ত পথ দেখাইয়া ও রসদাদি সরবরাহ করিয়া নিজ প্রভু * দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীরের সেনাপতি মানসিংহকে

---

* Bhabanando a Bramin was a clerk in the Hooghiy Canoongoe Duptor and got himself appointed to the Zamindary of Perganah Bugwan, Nuddea and fourteen mehals in room of Hurry hoor ahd Cassinat Chowdhury."—Account of the origin and progresive increase of the four great Zamindaries of Bengal, delivered into the Bengal Reveniew committee in 1786, by their Dewan Ganga Gobinda Sing—Dissertation conceining the landed property of Bengal by C. W. Boughton Rause 1791.

"Acording to prevalent tradition or anthentic archives of the khalsa, Bhobanando Mazumdar or temporary recorder of the Jumna of the Circir of Hooghly and crory or Zamindar of the pergunnah of Aukhera &c, in the first man of note, in geneotogical 5th History Report—Grants view of the Reveniew of Bengal 1786

ভবানন্দ যে প্রতাপাদিত্যের অধীনে কখনও কোনও কার্য্য করেন নাই পরন্তু তিনি দিল্লীশ্বরের অধীনে হুগলীর কাননগুই ছিলেন সে সম্বন্ধে নিখিল বাবু তাঁহার প্রতাপাদিত্য পুস্তকে ১ম সংস্করণ ১৬০ পৃষ্ঠায় এইরূপ লিখিয়াছেন,—"ভবানন্দ সম্বন্ধে সাহিত্য ও নাট্য জগতে নানাপ্রকার অভিনয় হইতেছে। তাঁহাকে প্রতাপাদিত্যের অধীন কর্ম্মচারীরূপে চিত্রিত করিয়া তাঁহার দ্বারা নানাপ্রকার অভিনয় হইতেছে। আমরা কিন্তু ইহার কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ পাই নাই। ভবানন্দ যে প্রতাপাদিত্যের অধীন কর্ম্মচারী ছিলেন তাহা প্রথমে ডাক্তার যোগীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্যের Hindu Castes and Sects নামক গ্রন্থে দৃষ্ট হয় :—

"For a time Protapaditya defied the great Akbar and the conquest of his kingdom was ultimately effected by Raja Mansingha, chiefly through the treachery of Bhobanando Mazumdar who had been in service of Protapaditya a pet Brahman boy "ভট্টাচার্য্য মহাশয় কোন প্রমাণের বলে এরূপ লিখিয়াছেন তাহার উল্লেখ করেন নাই। শ্রীযুক্ত সত্য চরণ শাস্ত্রীও ঐ মতের অনুসরণ করিয়াছেন। তিনি এতৎ সম্বন্ধে কয়েকটী প্রবাদের মাত্র উল্লেখ করেন। তাহার পর কোন কোন উপাখ্যান ও নাটকে

মজুমদার তাঁহার পিতার ন্যায় দীর্ঘজীবি হইয়াছিলেন। কথিত আছে তাঁহার প্রিয় সন্তান গোপালের পুত্র রাঘব জন্মগ্রহণ করিলে তিনি বহু সমারোহে পৌত্রৎসব সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ইহার আর এক পৌত্রের নাম উল্লেখ যোগ্য। তিনি ভবানন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীকৃষ্ণের তনয় নাম গোপীরমণ কথিত আছে একবার নবাব সরকারে খাজনা বাকী পড়ায় ভবানন্দকে ঢাকার নবাব কারাগারে শৃঙ্খলা করিয়া রাখা হয়। সে সময় মহাবলশালী গোপীরমণও পিতামহের সহিত এই জাহাঙ্গীর নগরে আগমন করিয়াছিলেন। পিতামহের এই বিপত্তি কালে তিনি কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া তাঁহার উদ্ধারের উপায় চিন্তা করিতেছিলেন এমন সময় বিধির কৃপায় সত্যই এক সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল। চিন্তাকুলিত চিত্তে ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি নদীতীরে যাইয়া দেখিলেন যে বহু লোক সমবেত হইয়া একটী মহাগজ দ্বারা তত্রস্থ একখানি সুবৃহৎ প্রস্তর খণ্ড সরাইবার চেষ্টা করিতেছে কিন্তু হস্তী শুণ্ডদ্বারা উপযুক্ত ভাবে ধরিবার সুবিধা না পাওয়ায় কিছুই করিতে পারিতেছে না। সমবেত জনমণ্ডলীও বহু চেষ্টায় হস্তীর কোন সাহায্য করিতে সক্ষম হইতেছে না। পরাক্রমশালী গোপীরমণ এই দৃশ্য দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার বীর হৃদয় ঐ প্রস্তর খণ্ড উত্তোলনে তাহাকে উৎসাহিত করায় তিনি সমবেত জনতাকে দূরে যাইতে বলিয়া একাকী মহাপরাক্রম প্রকাশে সেই বিশাল প্রস্তর খণ্ড উত্তোলন করিয়া কিয়দ্দূরে অপসারিত করিয়া দিলেন। সমবেত জনসঙ্ঘ সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব শক্তি অবলোকনে আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে এই কথা সমস্ত সহরময় পরিব্যাপ্ত হইল এবং ক্রমে নবাবেরও শ্রুতি গোচর হইল। তখন নবাব এই বীর পুরুষের বীরত্বের প্রমাণ চাক্ষুষ দেখিতে অভিলাষী হইয়া তাঁহাকে তৎপরদিন নিজ প্রাসাদে আহ্বান করিলেন, সেখানে উপস্থিত হইয়া গোপীরমণ নানামতে স্বীয় পরাক্রম

প্রকাশ দ্বারা নবাবের কৃপালাভে সমর্থ হইলে নবাব তাঁহাকে পুরস্কৃত করিতে অভিলাষ করেন। কৌশলী গোপীরমণ এই সূত্রে নিজ পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক স্বীয় পিতামহের কারা মোচন প্রার্থনা করিলেন। নবাবও হৃষ্ট হইয়া কারা রক্ষীকে সত্বর ভবানন্দের শৃঙ্খলমোচন করিয়া তথায় আনিতে আদেশ দিলেন। কিন্তু গোপীরমণ কৃতাঞ্জলী পূর্ব্বক নবাবকে বলিলেন যে পিতামহকে শৃঙ্খল শুদ্ধ সেখানে আনয়ন করা হউক তিনি স্বহস্তে তাঁহার বন্ধন মোচন করিবেন। তাঁহার প্রার্থনামত ভবানন্দকে শৃঙ্খলিত অবস্থায় সেখানে আনিলে গোপীরমণ স্বহস্তে সেই সুদৃঢ় শৃঙ্খল সূত্রের ন্যায় ছিন্ন করিলে সভাস্থ সকলে ধন্য ধন্য করিয়া উঠিলেন। ভবানন্দ এইরূপে সেবার পৌত্রকর্ত্তৃক কারামুক্ত হইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য-শরীরে কখন কি ঘটে মনে করিয়া নিজ বিষয়ের বন্দোবস্ত করিতে অভিলাষী হইয়া নিজ সহোদর প্রত্যেককে উপযুক্ত বিষয় দান করিলেন এবং তিনি পুত্রগণকে নিকটে আহ্বান করিয়া বিষয় বণ্টনের কথা উল্লেখ করিলে জ্যেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে বিষয় আবার বণ্টন কি হইবে উহাতে জ্যেষ্ঠেরই অধিকার অপরে মাসহারার অধিকারী মাত্র। তাহাতে ভবানন্দ বলেন যে এক জনের উপার্জ্জিত বিষয় একাকী অধিকার করিতে সবারই অভিলাষ হয় কিন্তু ক্ষমতা থাকে নিজে উপার্জ্জন কর দেখি। প্রত্যুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলেন আপনি মহাগুরু, যখন আদেশ করিতেছেন তখন তাহা আর আশ্চর্য্য কি! তাহাই হউক আমি স্বয়ংই বিষয় উপার্জ্জন করিয়া লইব। এই বলিয়া তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া মাটিয়ারীর শ্রীনারায়ণ মল্লিক নামক * এক বিশ্বস্ত কার্য্যদক্ষ বহু ভাষাবিৎ মন্ত্রী সমভিব্যাহারে দিল্লীগমন করতঃ

* নদীয়া কাহিনী (দ্বিতীয় সংস্করণ) ২৯০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তথায় আপনার বুদ্ধিবলে ও উক্ত কর্মচারীর লিপি-কুশলতায় বাদসাহকে সন্তুষ্ট করিয়া পরগণা ও উখড়া ও কুশদহের উপর চিরস্থায়ী দখলের ফারমান প্রাপ্ত হইয়া পিতৃসন্নিধানে প্রত্যাবর্ত্তন করেন; কিন্তু বাদসাহদত্ত সম্মান তাঁহাকে বেশী দিন ভোগ করিতে হয় নাই। নিদারুণ বসন্তরোগে নিঃসন্তান অবস্থায় তিনি প্রাণত্যাগ করিলে তাঁহার কনিষ্ঠ গোপালই তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়েন। পিতৃনির্দ্দেশে গোপালই ভবানন্দের সমগ্র বিষয়ের অধিকারী হয়েন †। কনিষ্ঠ বিষয়-কার্য্যে অনভিজ্ঞ গোবিন্দ মাসহারা ভোগী হয়েন।

এই সময়ে ভবানন্দ বৃদ্ধ হওয়ায় বিষয়ে বীত রাগ হইয়া মধ্যম পুত্র গোপালের উপর বিষয়ের ভার দিয়া ধর্ম্মার্জ্জনে মন দেন; কিন্তু তখনও তাঁহার পিতামাতা বর্ত্তমান থাকায় তিনি তীর্থবাসী হইতে পারেন নাই। ইতিপূর্ব্বে মানসিংহের সহিত দিল্লীযাত্রা কালে ভারতের সর্ব্বতীর্থ দর্শন করিয়াছিলেন। বিষয় হইতে অবসর লইয়া অধিকদিন তিনি জীবিত ছিলেন না। পিতামাতা বিদ্যমানেই তিনি দুই পুত্র ও পৌত্রাদি রাখিয়া

---

† অন্নদা কহেন চল ব্যাজ নাহি আর।
প্রিয় পুত্র যেই তারে দেহ রাজ্যভার॥
মজুমদার কন আমি কি জানি তাহার।
উপযুক্ত বুঝিয়া নিযুক্ত কর তার॥
অন্নদা কহেন তবে ভাবিষ্যত কই।
মোর প্রিয় গোপাল ভূপাল হবে অই॥
সম্পদরে মোর ঝাঁপি রাখিবেক এই।
যার স্থানে ঝাঁপি রবে রাজা হবে সেই॥

অন্নদামঙ্গল,

বয়পুত্র ভবানন্দের সহিত অন্নদার কথা অধ্যায়।

স্বর্গগমন করেন। তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার দুই প্রিয়তমা সহধর্ম্মিনীই সহমৃতা হয়েন। *

পিতা ও ভ্রাতার ন্যায় গোপলও পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ত্যক্ত সম্পত্তি ব্যতীত বাদসাহকে সন্তুষ্ট করিয়া শান্তিপুর, শাহপুর, ভালুকা, রাজপুর প্রভৃতি পরগণার স্বামীত্ব লাভ করেন, এইরূপে নদীয়া রাজ্য দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে কিন্তু গোপাল পিতামহের ন্যায় আদৌ দীর্ঘজীবি হইতে পারেন নাই। মাত্র সাতবৎসর রাজ্য করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন।

তাঁহার তিন পুত্র নরেন্দ্র, রামেশ্বর ও রাঘব। এই তিনজনের মধ্যে কনিষ্ঠ রাঘব সর্ব্বাপেক্ষা কর্ম্মদক্ষ বিধায় পিতৃনির্দেশানুযায়ী পিতৃরাজ্যের উত্তরাধিকারী হয়েন। তিনি অতি সুশীল ও ধার্ম্মিক নরপতি বলিয়া খ্যাত। তাঁহারই রাজ্যকালের অব্যাবহিত পূর্ব্বে বাঙ্গলার বহুভূস্বামী

---

* ভবানন্দ মজুমদার সুতে দিয়া রাজ্যভার
বাপ মায় প্রবোধ করিয়া।
পূর্ব্ব কথা মনে করি বসিলেন ধ্যান করি
স্বর্গে যান শরীর ছাড়িয়া॥
সীতারাম মজুমদার করিলেন হাহাকার
প্রজাগণ কাঁদিল বিকল।
অমাত্য অপত্যগণ সবে শোকে অচেতন
ক্রন্দনের উঠিল কোলাহল॥
চন্দ্রমুখী পদ্মমুখী স্বর্গে যাইবারে সুখী
সহমৃতা হইল হাসিয়া।
চড়িয়া পুষ্পক রথে চলিলা আকাশ পথে
বন্ধুগণে বেষ্টিত হইয়া॥

ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর লিখিত মানসিংহ দ্রষ্টব্য।

অত্যাচারী মুসলমান শাসন-কর্ত্তাগণের বিপক্ষে মস্তকোত্তলন করেন। নদীয়ার তদানীন্তন অন্যতম ভূস্বামী দেবগ্রামস্থ কুম্ভকার বংশীয় রাজা দেব পাল তাঁহাদের অন্যতম। কালের কঠোর নিষ্পেষণে এই কুবের সদৃশ ধনশালী শক্তিমান ভূস্বামীর বিস্তীর্ণ প্রাসাদ, বিশালপুরী ও সুগভীর পরিখাদি অধুনা ধ্বংশ হইয়া "দেপাঁর ঢিবি" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহা এক্ষণে "দেপালি" নামক পথের উপর ই, বি, রেলের মাঝের. গ্রাম নামক ষ্টেশন হইতে তিন মাইল উত্তরে অবস্থিত। দেবগ্রামস্থিত এই পর্ব্বতাকৃতী ধ্বংশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সহৃদয় দর্শক মাত্রেরই চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠে। এখনও ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত এনামেলের ইট, কারু-কার্য্য খচিত প্রস্তরাদি ও প্রাসাদের পরিখাপ্রান্তে অবস্থিত চারিটী মৃত্তিকা-স্তূপ, যাহার গঠন প্রণালী দেখিলে পূর্ব্বে শত্রুসৈন্যের গতিবিধি পর্য্যালোচনার নিমিত্ত স্থাপিত বলিয়া অনুমিত হয় এবং অসংখ্য পুষ্করিণী বিশেষতঃ শোকাবহস্মৃতি বিজড়িত রাজঅন্তঃপুরসংলগ্ন সুবিস্তীর্ণ সরোবর স্বতঃই প্রাণের অন্তস্তলে একটা বিষাদের চিত্র অঙ্কিত করে। *

রাজা দেবপাল সম্বন্ধে নানাবিধ কিবদন্তী প্রচলিত আছে। তাহাদের মধ্যে কতটুকু ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে তাহা অবধারণ করা সুকঠিন। সুকবি ভারতচন্দ্র তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ অন্নদামঙ্গলান্তর্গত মানসিংহ-গ্রন্থে স্বর্গগমনোদ্যত ভবানন্দ মজুমদারের দেবী অন্নদার কথোপকথন ছলে নবদ্বীপ রাজবংশের যে ভবিষ্যৎ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, অর্থাৎ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে রাজসভায় বসিয়া ভারতচন্দ্র নদীয়ারাজ-বংশের যে অতীত কাহিনী দেবীমুখ হইতে ভবিষ্যৎ-বাণীরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায় যে দেবপালের নিধনের পর তাঁহার

* নদীয়া কাহিনী দ্বিতীয় সংস্করণ ২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

"রাজ্যধন" সমস্তই কিছু দিনান্তর রাজা রাঘবের অধিকারভুক্ত হয়। *

এই বিশাল রাজ্য তাঁহার নিজের সুবিস্তীর্ণ অধিকার-ভুক্ত হওয়ায় তাঁহার যশঃ ও খ্যাতি সমধিক বর্দ্ধিত হয় এবং দিল্লীশ্বরের নিকটে তিনিই এই বংশে সর্ব্বপ্রথম "মহারাজা" উপাধি লাভ করেন। মহারাজা রাঘব যেমন একদিকে বৈবয়িক উন্নতি করিয়াছিলেন তেমনি নানা সংকীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি মাটিয়ারি হইতে রেউই নামক স্থানে তাঁহার রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। কথিত আছে এই রেউই ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশ সমূহ খড়িয়া নদীর উপরে শ্যামল বৃক্ষাদি শোভিত মনোরম স্থান ছিল এবং সেই সময়ে এখানে দলে দলে মৃগ ও ময়ূর বিচরণ করিত। অদ্যাপি এই সকল মৃগের দুই চারিটী কৃষ্ণনগরের নিকটবর্ত্তী আড়বান্দী প্রভৃতি গ্রামের প্রান্তরে দৃষ্ট হইয়া

---

* গোপালের পুত্র হবে বড় ভাগ্যধর।
রাঘব হইবে নাম রাঘব সোসর॥
দেশীয় আছিল রাজা বেপাল কুমার।
পরশ পাইয়াছিল বিখ্যাত সংসার॥
আমার কপটে তার হয়েছে নিধন।
রাঘবেরে দিব আনি তাঁর রাজ্যধন॥
গ্রাম দীঘী নগর সে করিবে পত্তন।
দীঘী কাটি করিবেক শঙ্কর স্থাপন॥
তাঁর পুত্র হইবেক রাজা রুদ্ররায়।
বাড়িবেক অধিকার আমার দয়ায়॥
গঙ্গাতীরে নবদ্বীপে শঙ্কর স্থাপিবে।
পৃথিবীতে কীর্ত্তি রাখি কৈলাসে যাইবে॥

অন্নদামঙ্গলান্তর্গত মানসিংহ।

থাকে। নগর স্থাপনা করিয়া তিনি ইহার চতুর্দ্দিক পরিখা বেষ্টিত করেন। ঐ পরিখা সাধারণতঃ "সহর পানার গড়" নামে খ্যাত, এবং সেটিই বর্ত্তমান কৃষ্ণনগর।

সাধারণের জলকষ্ট নিবারণার্থ তিনি শান্তিপুর ও কৃষ্ণনগরের মধ্যস্থলবর্ত্তী পথের সন্নিধানে বিংশতি সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে এক সুদীর্ঘ দীর্ঘিকা খনন করাইয়া তদুপরিস্থিত গ্রামের "দীর্ঘিকানগর" বা "দীগনগর" নামকরণ করেন। এই দীঘিটী দৈর্ঘ্যে ১৪২৫ হস্ত ও প্রস্থে ৪২০ হস্ত পরিমিত। দিন দিন নিকটস্থ প্রান্তর ধৌত হইয়া রাশি রাশি মৃত্তিকা ও আবর্জ্জনাদি পড়িয়া ইহা ক্রমেই অপরিসর হইয়া পড়িতেছে। মহারাজা রাঘব এই জলাশয় খনন করিয়া ইহার পূর্ব্বতটে এক বৃহৎ ঘাট ও তদুপরি এক রম্য অট্টালিকা স্থাপন করিয়াছিলেন এবং উহার অনতিদূরে দুইটী মন্দির নির্ম্মান করিয়া রাঘবেশ্বর নামে শিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ঐ মন্দির-গাত্রে নিম্নলিখিত শ্লোকটী খোদিত আছে :—

শাকে সোমনবেষু চন্দ্রগোণিতে পুষ্যৈকরত্নাকরো
ধীর শ্রীযুত রাঘবোদ্বিজমণির্ভূমি ভুজাগ্রণীঃ।
নির্ম্মায় স্ফুরদূর্ম্মিনির্ম্মলজল প্রদ্যোতিনীং দীর্ঘিকাং
তত্তীরে কৃত রম্য বেশ্মনি শিবং দেবং সমস্থাপয়ৎ ॥

এই অট্টালিকা ও ঘাট ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। মন্দির দুইটীর একটী ভগ্ন হইয়াছে অপরটীও গতপ্রায়। রাজা রাঘব এই দীঘি ও মন্দির মহাসমারোহে মহতী ঘটাপূর্ব্বক উৎসর্গ ও স্থাপনা করেন। এতদ্ব্যতীত

অর্থ—১৫৯১ শকে (১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে) ব্রাহ্মণ শিরোমণি রাজশ্রেষ্ঠ ধীরমতি রাজা রাঘব এই স্বচ্ছজলসঙ্কুল উর্ম্মিময় দীর্ঘিকা খনন করাইয়া তত্তীরে এই সুরম্য মন্দির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক শিব স্থাপনা করিলেন।

তিনি "মর্দ্দানা" নামক গ্রামে আর একটী আবাস বাটী নির্ম্মান করিয়াছিলেন এবং ইহার সন্নিহিত বিল তড়াগাদিতে অজস্র ফুল্লারবিন্দের শোভায় আকৃষ্ট হইয়া ইহার শ্রীনগর নামকরণ করিয়াছিলেন। এই শ্রীনগর এখন বনাকীর্ণ, ম্যালেরিয়ার দারুণ প্রকোপে ইহা জনশূন্য এখানে প্রাসাদাদির ধ্বংশাবশেষ মাত্র বিদ্যমান আছে ও একটী মন্দির স্বীয় ললাটে রাঘবের নাম বহন করিয়া তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ দণ্ডায়মান আছে।

রাঘবের এই সকল সংকীর্ত্তিগাথা শ্রবণ করিয়া গুণগ্রাহী দিল্লীশ্বর তাৎকালিক শ্রেষ্ঠ সম্মানস্বরূপ তাঁহাকে একটী সুশিক্ষিত হস্তী উপহার দেন। এইরূপে বহুকাল রাজসম্মান ভোগ করিয়া তিনি একপঞ্চাশত বর্ষ রাজ্যভোগ করিয়া কর্ম্মোচিত-ধামে প্রস্থান করেন।

মহারাজা রাঘবের দুই পুত্র রুদ্র ও প্রতাপনারায়ণ, প্রতাপ পিতার অবাধ্য বিধায় মহারাজা রাঘব সম্রাটের অনুমতি ক্রমে রুদ্রকে বিষয়ের অধিকাংশ অর্পণ করেন। কথিত আছে রুদ্রের রাজত্বকালে তদানীন্তন বাদশাহ রেউইতে মৃগাদি প্রচুর সংখ্যায় পাওয়া যায় শুনিয়া এখানে মৃগয়ার আসিতে মনস্থ করেন। কিন্তু রাজা রুদ্র সসৈন্য বাদশাহের আগমনে দরিদ্র প্রজাগণের উপর অত্যাচারের আশঙ্কা করিয়া বহুমুদ্রা অঙ্গীকার করিয়া বাদসাহকে নিরস্ত করেন। *

ইনিও তাঁহার পিতার ন্যায় লোকহিতার্থে বহু সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। কৃষ্ণনগর হইতে শান্তিপুর পর্য্যন্ত সুপ্রসস্ত রাজবর্ত্ম টী অদ্যাপি তাঁহারই পুণ্য কীর্ত্তির স্মৃতি বক্ষে বহন করিতেছে। তিনি তাঁহার পিতার আরব্ধ নবদ্বীপস্থ শিবমন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য সমাপ্ত করিয়া তাঁহার পিতৃদেবের স্মৃতিতেই মহা সমারোহে তাহার স্থাপনাকার্য্য সম্পন্ন করেন

* নদীয়া কাহিনী ২য় সংস্করণ ৬৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এবং পিতার নামানুযায়ী শিবের রাঘবেশ্বর নামকরণ করেন। এবং পিতার রাজধানীর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রীত্যার্থে কৃষ্ণনগর নাম করন। তিনি এককালে সহস্র গোদান ও তুলা পুরুষাদি মহাদানে ক্রিয়া মহাব্যয়ে সুসম্পন্ন করেন।

দিল্লীশ্বর অলমগীর তাঁহার এই সকল সৎকীর্ত্তি গাথা শ্রবণ করিয়া ১৬৭৬ অব্দে (১০৮৭ হিজরীতে) তাঁহাকে এক ফারমান দ্বারা গয়েশপুর হোসেনপুর, খাড়ি, জুড়ি প্রভৃতি কয়েকটী বিস্তীর্ণ পরগণার স্বামীত্ব প্রদান করেন, এবং তাহার প্রাসাদের উপরিভাগে দিল্লীশ্বরের প্রাসাদের অনুকরণে কাঙ্গাড়া * নিশ্মানের অধিকার দেন। তাঁহার সময়ে নদীয়ারাজ্য অতি বিস্তীর্ণ আকার ধারণ করে। এই সুবিস্তীর্ণ ভূমির রাজস্ব হিসাবে তখন বিংশতিলক্ষাধিক মুদ্রা জাহাঙ্গীরার শুভার মারফাতে মোগল সরকারে কর প্রেরণ করিতে হইত।† ইহাঁর সহিত জাহাঙ্গিরার তাৎকালিক শুভার প্রথমে তাদৃশ সদ্ভাব ছিল না। কথিত আছে মহারাজা অতি নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন পাছে শুভার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তথায় কোনও সংস্পর্শ দোষ ঘটে এই ভয়ে তিনি শুভার প্রেরিত দূত বা রাজকর্ম্মচারীগণকে নিজ রাজধানীতে বহুসমাদর করিলেও রাজগী পাইয়া কোনও দিন জাহাঙ্গিরাতে যান নাই। তাঁহার এই ব্যবহারকে দাম্ভিকতা ও শুভার প্রতি তাচ্ছিল্যভাব মনে করিয়া শুভা তাঁহাকে কৌশলে হুগলী আনয়ন পূর্ব্বক বন্দী করিয়া জাহাঙ্গীরায় প্রেরণ করেন, কিন্তু সসম্মানে তাঁহাকে কারাগারের

* বর্ত্তমান কালে দুর্গা প্রতিমার চালে যে কলকা দেওয়ার প্রথা হইয়াছে তাহা এই "কাঙ্গাড়ার" অনুকরণ মাত্র। এখানে ইহাও বলা আবশ্যক যে প্রতিমার ডাকের সাজের প্রথম সৃষ্টি নদীয়া রাজাধিকারে উলা গ্রামে।

† Vide Hedges Diary Vol I, P. 29.

বাহিরে থাকিতে আদেশ দেন। এখানে আসিয়া সুশান্ত নির্ব্বিরোধী মহারাজ শুভার সহিত দরবারে সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই দরবারোচিত পরিচ্ছদ পরিধান করিতে স্বীকৃত হইলেন না। সেই তাঁহার চিরন্তন প্রথানুযায়ী ত্রিকচ্ছ করিয়া বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক মোটাতিলক ও রুদ্রাক্ষমালায় সুশোভিত হইয়া দরবারে উপস্থিত হইলেন। শুভা তাঁহার সেই ঋষিজনোচিত সৌম্যমূর্ত্তি ও অগাধ পাণ্ডিত্যে প্রীত হইয়া তাঁহার প্রতি বিরুদ্ধভাব ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে বন্ধুভাবে মহাসমাদর ও বহুমান্য করিলেন। তিনিও নানারূপে শুভাকে সন্তুষ্ট করিয়া কৃষ্ণনগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং আসিবার কালীন "আলালদোস্ত" নামক একজন প্রসিদ্ধ সুনিপুন পূর্ত্তকার্য্যক্ষম স্থপতিকে সঙ্গে আনিয়া কৃষ্ণনগর প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে তাঁহার সহায়তায় চক, কাছারী বাটী, পূজার বাটী, নাচঘর ও কেল্লা, ফিলখানা, নহবতখানা প্রভৃতি নির্ম্মাণ করেন। ইহাঁর নির্ম্মিত নাচঘর, ফিলখানা চকবাটী ও নহবতখানা অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত তিনি কৃষ্ণনগরস্থ "দেবীপ্রসাদ" নামক জনৈক মিস্ত্রীর দ্বারা বহু অট্টালিকা শোভিত অন্দর মহল নির্ম্মান করেন এবং জনৈক নদীবিহারী মুসলমানের উপর বিরক্ত হইয়া তাঁহার প্রাসাদ-পাদ-চারিনী অঞ্জনা নদীর স্রোতবেগ রুদ্ধ করিয়া একটী বিশাল বিলে পরিণত করেন। বর্ত্তমানে উহার জলহীন খাদ, কঙ্কাল বাহির করিয়া প্রতাপশালী রুদ্রের অসাধ্য সাধন ক্ষমতার সাক্ষ্য দিতেছে মহারাজা রুদ্রের ক্ষমতা সম্বন্ধে এইরূপ বহু কথা প্রচলিত আছে, তিনি একদিকে যেমন গম্ভীর ও আদর্শ নরপতি বলিয়া খ্যাত তেমনি আবার তাঁহার সম্বন্ধে বহু কৌতুক কাহিনীও প্রচলিত আছে। এখানে একটী উল্লেখিত হইল। কথিত আছে মাটীয়ারীর দুই ব্রাহ্মণ সন্তান পৈতৃক ধনবিভাগসূত্রে পরস্পর মহা কলহ করিয়াও কোনওরূপ

মীমাংসা করিতে না পারায় পরিশেষে মহারাজা রুদ্রের সকাশে বিচারপ্রার্থী হয়েন। মহারাজা উভয়ের বক্তব্য শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে তাহাদের পিতা বিভাগযোগ্য কোন সম্পত্তিই রাখিয়া যান নাই। এই দুই ব্রাহ্মণ কেবল পরস্পর মনের অনৈক্যতা বশতঃ মিথ্যা বিবাদের সৃষ্টি করিয়া অশান্তি ভোগ করিতেছে। তাই তিনি তাহাদিগকে আদেশ করিলেন "দেখ বাপু তোমাদের পিতা যখন বণ্টন যোগ্য কোনও সম্পত্তিই রাখিয়া যান নাই তখন বৃথা কলহে প্রয়োজন কি? পরস্পর শত্রুভাব ত্যাগ করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন কর।" কিন্তু তাহারা তাঁহার ঐ বাক্যে সন্তুষ্ট না হইলে তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তোমাদের পিতার উপাধি কি? তাহারা নিবেদন করিল "ভট্টাচার্য্য।" তখন কৌতুকী মহারাজ বিচার পূর্ব্বক ইহাই ধার্য্য করিলেন যে যখন তাহাদের বণ্টন যোগ্য পিতৃসম্পত্তি কিছুই নাই তখন তাহারা তাহাদের পিতৃত্যক্ত ভট্টাচার্য্য উপাধি ভাগ করিয়া লইবে ও এখন হইতে জ্যেষ্ঠ ভট্ট উপাধি গ্রহণ করিয়া মাটিয়ারিতে বাস করিবে ও কনিষ্ঠ আচার্য্য উপাধি গ্রহণ করিয়া কুড়ালিগাছি গ্রামে বাস করিবে। অদ্যাপি ঐ দুই বংশীয়েরা ঐ দুই গ্রামে থাকিয়া রুদ্রের কৌতুককীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। রাজা রুদ্র যেমন কীর্ত্তিমান ছিলেন তেমনি এতদঞ্চলে বিদ্যার উন্নতিসাধন মানসে অধ্যাপকমণ্ডলীকে বহু নিষ্কর ভূমি দান করিয়া যান এবং নবদ্বীপের বিদেশাগত ছাত্রগণের ব্যয়ের নিমিত্ত বহু টাকা ও ভূসম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া যান। * এইরূপে

* নদীয়ার সুবিখ্যাত রাজবংশের বদান্য রাজগণ সম্ভবতঃ মহারাজা রুদ্রের এই দান হইতে পরে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের হস্তে নদীয়ার টোলসমূহে মাসিক সাহায্য কল্পে ১২০ পাউণ্ড বাৎসরিক আয়ের সম্পত্তি দান করেন। ১৮২৯ খৃ ষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট ঐ সাহায্য

বহু ক্রিয়াসম্পন্ন করিয়া পুণ্যশ্লোক মহারাজা রুদ্র লোকান্তর গমন করেন। তাঁহার দুই রাণী। জ্যেষ্ঠা মহিষীর গর্ভে রামচন্দ্র ও রামজীবন ও কনিষ্ঠা রাণীর গর্ভে রামকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। রুদ্র তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রকে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত বিবেচনায় তাঁহাকেই তাঁহার উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র হুগলীর ফৌজদার ও ঢাকার নবাবের সহায়তায় পৈতৃক জমিদারী অধিকার করেন কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা রামজীবন শক্তি সঞ্চয় করিয়া তাঁহাকে অধিকার চ্যুত করেন কিন্তু তিনি শীঘ্রই আবার জ্যেষ্ঠ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়াছিলেন। এই সময়ে রামচন্দ্রের মৃত্যুতে মধ্যম রামজীবন আবার রাজ্য অধিকার করিয়া লয়েন, কিন্তু অনতিবিলম্বে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রামকৃষ্ণের কৌশলে তিনি ঢাকার নবাব কর্ত্তৃক কারারুদ্ধ হন এবং রামকৃষ্ণ পুনরায় পিতৃরাজ্য অধিকার করেন। এই সময়ে তিনি রুদ্রের পদাঙ্ক অনুশরণ করিয়া নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্যকল্পে বহুমুদ্রা আয়ের ভূসম্পত্তি দান করিলে নবদ্বীপস্থ পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে "নবদ্বীপাধিপতি" এই মহাসম্মান সূচক উপাধি ভূষিত করেন। তদবধি তদীয় বংশধরেরা এই মহা সম্মানসূচক— উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন। রাজা রামকৃষ্ণের সময়েই বর্দ্ধমানে শোভাসিংহের বিদ্রোহ ঘটে। ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে শোভাসিংহ নামক জনৈক বর্দ্ধমানের ক্ষুদ্র তালুকদার, তদানিন্তন বর্দ্ধমানাধিপতি রাজা রামকৃষ্ণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে এবং রহিম খাঁ নামক আফগান সর্দ্দারের সহিত

বন্ধ করেন। পরে নদীয়ার ছাত্র ও অধ্যাপকবৃন্দের ঐকান্তিক প্রার্থনায় মহাশয় গবর্ণমেণ্ট উহা পুনরায় মঞ্জুর করেন; তদবধি মাসিক ২০০৲ উপস্থিত মাসিক ৩০০৲ নিয়মিত দান করিয়া আসিতেছেন Vide Hunter's statistical Account of Nodiya P. 111.

মিলিত হইয়া রাজা কৃষ্ণরামের প্রা সংহারপূর্ব্বক তদীয় প্রাসাদ অধিকার করে। বর্দ্ধমান রাজকুমার জগৎকুমার পলায়নপূর্ব্বক নদীয়া-রাজ রামকৃষ্ণের শরণ করেন। * শোভাসিংহ ও রহিম খাঁর সম্মিলিত শক্তি এই সময়ে হুগলী অধিকার করে কিন্তু তাহারা ওলন্দাজগণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া সপ্তগ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। এই স্থান হইতে শোভাসিংহ তাহার সৈন্যের অধিকাংশ রহিম খাঁর অধীনে নদীয়া ও মুরশিদাবাদ অধিকার করিতে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং বর্দ্ধমানাধিপতির কুমারি কন্যার রূপে আকৃষ্ট হইয়া বর্দ্ধমান যাত্রা করে এবং সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া রাজকুমারীর ধর্ম্মনাশে উদ্যত হইলে তেজস্বিনী রাজকুমারি ছুরিকাঘাতে কামোন্মত্ত পশুর প্রাণনাশ করেন। তাহার নিধনের পর তাহার ভ্রাতা হিম্মত সিংহ তাহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া ১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজমহল হইতে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত অধিকারপূর্ব্বক দেশে অরাজকতা আনয়ন করে। এই সময়ে ইংরাজগণ কলিকাতায় মহামান্য ইংলণ্ডেশ্বর তৃতীয় উইলিয়মের নামানুসারে ফোর্ট উইলিয়াম নামকরণ করিয়া তাহাদের দুর্গ দৃঢ়তররূপে স্থাপন করেন এবং ওলন্দাজেরা চুঁচুড়ায় ও ফরাশিরা চন্দননগরে আত্মরক্ষার বিশেষ বন্দবস্ত করিয়া লন। তদানীন্তন বাদসাহ ঔরঙ্গজেব বাঙ্গলায় শান্তিস্থাপনার্থ তাঁহার প্রিয় পৌত্র সাজাদা আজিমওশানকে বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে এদেশে প্রেরণ করেন। ইনি আসিয়া দেখিলেন যে শোভাসিংহ নিহত হইয়াছে এবং নবনিযুক্ত বঙ্গেশ্বর জবরদস্ত খাঁ বিদ্রোহ অনেক পরিমাণ দমন করিয়াছেন, সুতরাং নিজে বর্দ্ধমানে থাকিয়া দেশস্থ সমস্ত ভূম্যাধিকারীগণের সহিত প্রীতি বিনিময় ও আনন্দোৎসব করিতে থাকেন। এই সময়ে তদানীন্তন নদীয়া-

* Vide Memoirs of the Mogul Empire by Eradut Khan, p. 330.

ধিপতি রামকৃষ্ণের সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহৃদ্য স্থাপিত হয়। এই সময়ে নদীয়া রাজবংশ কি মুসলমান শাসনকর্তা * কি য়ুরোপিয় শাসনকর্তা সকলের নিকট বিশিষ্ট সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তাৎকালীক ইংরাজ বড়সাহেবের সহিত তাঁহার বিশেষ প্রণয় স্থাপিত হয়। এমন কি নদীয়ারাজের শাসন সৌকার্য্যার্থ তিনি সার্দ্ধ দ্বিসহস্র অস্ত্রনিপুণ সৈন্য কৃষ্ণনগরের থাকিতে অনুজ্ঞা করেন; কথিত আছে কৃষ্ণনগর গোয়াড়ির পুরাতন কালেক্টরী বাটীতে ঐ সকল সৈনিকের আবাস নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল এবং ঐ বাটী ঐ কারণেই নির্ম্মিত হইয়াছিল।

বাদশাজাদা আজিমওশান নদীয়ারাজ রামকৃষ্ণকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। দেওয়ান জাফর খাঁর তাহা ভাল লাগিত না। রামকৃষ্ণের উপর তাহার বিজাতীয় বিদ্বেষভাব ছিল কিন্তু তখন তিনি দেওয়ানমাত্র কাজেই রামকৃষ্ণের কোনও অনিষ্ট করিতে সাহসী হন নাই। জাফর খাঁ মুরশিদকুলী খাঁ নাম গ্রহণ করিয়া যখন দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে বাঙ্গলার শাশন কার্য্য গ্রহণ করিলেন তখন রামকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার পূর্ব্ববিদ্বেষ জাগরিত হইয়া উঠিল এবং রাজস্ব অনাদায় ব্যপদেশে কৌশলে তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন। পাটুলির রাজা রঘুদেব রায় মহাশয় একথা শুনিতে পাইয়া আপনি তাহার সমুদয় দেনা পরিশোধ করিয়া তাঁহাকে সে যাত্রা নযকমুক্ত করিয়া দেন। রঘুদেবের এই

---

* Ramkrishna lived happily at Krisnagar for a long time and any matter of interest of which he gave notice to the grandson of the Sultan of Delhi who resided at Johangira was excecuted without fail by the latter who scarcely having got notice of it gave his instruction in a letter of answer.—W. Perth's translation of Khitish Vansabali Charitam.

বদান্যতায় মোহিত হইয়া নবাব রঘুদেবকে "শূদ্রমণি" উপাধি প্রদান করেন, কিন্তু তাহাতেও রামকৃষ্ণের পাপগ্রহ কাটিল না; অল্পদিন পরে পুনরায় রাজস্ব বাকী পড়ায় নবাব তাহাকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়া রাজস্ব পরিশোধের নিমিত্ত একটা সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। আদেশ থাকে যে উক্ত দিনের মধ্যে টাকা না আসিলে তাঁহার জাতিধর্ম্ম-নাশ করা হইবে। একদিন দুই দিন করিয়া নির্দ্দিষ্ট দিন আসিল কিন্তু এবারে রামকৃষ্ণের টাকা আসিয়া পৌছিল না। ওদিকে অন্যতম কারারুদ্ধ সমুদ্রগড়ের রাজার টাকা আসিল। সমুদ্রগড়ের উদার হৃদয় রাজা দেখিলেন যদি দুর্ব্বৃত্ত নবাব নদীয়াধিপতির ধর্ম্মনাশ করে তবে বাঙ্গলার হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন নাশ হওয়া হেতু ক্রমে দেশ হইতে ধর্ম্মলোপ পাইবে। তাই তিনি রঘুদেবের মহৎ দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া আপনার সমস্ত অর্থ রাজা রামকৃষ্ণের নামে সরকারে জমা দিলেন। রঘু-দেব যে কার্য্যের জন্য শূদ্রমণি উপাধিতে ভূষিত হইলেন সেই কার্য্যের জন্যই সমুদ্রগড়ের রাজার ভাগ্যে অন্যরূপ ব্যবস্থা হইল। তিনি স্বীয় রাজস্ব দিতে না পারায় নবাবের আদেশে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। যদিও সমুদ্রগড়াধিপতির মহত্বে সে যাত্রায় রাজা রাম-কৃষ্ণের নিষ্কৃতিলাভ ঘটিয়াছিল কিন্তু কারাগারের দারুণ কষ্টে তিনি ভগ্ন স্বাস্থ্য হইয়াছিলেন বিশেষ জাতিধর্ম্মনাশ ভয়ে তিনি এযাবৎ জীবন্মৃত হইয়াছিলেন এক্ষণে মুক্তির আদেশ পাইয়াও আর তাঁহাকে জীবিত অবস্থায় কারাগার ত্যাগ করিতে হয় নাই। কারাক্লেশে দারুণ বসন্ত রোগে তাঁহার প্রাণত্যাগ ঘটে।

রাজা রামকৃষ্ণ এইরূপে অপুত্রক অবস্থায় কারাগারে প্রাণত্যাগ করিলে নদীয়া সিংহাসন কাহাকে বর্ত্তিবে এই লইয়া সে সময় তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। রাজা রামকৃষ্ণের পরম সুহৃদ সাজাদা আজিম

ওশান তাঁহার শোচনীয় মৃত্যু সংবাদে আন্তরিক ব্যথিত হইয়া জাফর খাঁর প্রতি এক পরোয়ানা জারী করেন এবং রামকৃষ্ণের যাবতীয় সম্পত্তি ও নদীয়া রাজ পুত্র ও পৌত্র অভাবে দত্তক পুত্র বা তদ্বৎ সম্পর্কীয় কোন ব্যক্তিকে দান করিতে অনুজ্ঞা করেন। জাফর রামকৃষ্ণের প্রতি অসদ্ব্যবহার করিলেও এক্ষণে সাজাদার আজ্ঞা উপেক্ষা করিতে সাহসী না হইয়া লিখিলেন যে রামকৃষ্ণের পুত্রাদি বা উত্তরাধিকারী কেহই বিদ্যমান নাই তাহাতে সাজাদা নদীয়ারাজ্য রামকৃষ্ণের স্ত্রী ও আত্মীয়গণের স্বচ্ছন্দতার উপর দৃষ্টি রাখিতে সক্ষম এরূপ কোনও বিশ্বস্ত রাজকর্ম্মচারীকে দান করিতে বলেন। এতদুত্তরে জাফর খাঁ পুনরায় লিখিলেন যে রামকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামজীবন যিনি বহুদিন যাবৎ ঢাকায় বন্দী অবস্থায় আছেন অনুমতি হইলে তাঁহাকে নদীয়া রাজ্য প্রদান করা যায়। সাজাদা আজিমওশান জাফারের এই প্রস্তাবে সম্মত হয়েন। এইরূপে রামজীবন তাঁহার মুক্তির নিমিত্ত জাফরকে বহু অর্থ অঙ্গীকার করিয়া নদীয়া সিংহাসন অধিকার করেন। * কিন্তু তিনি যথাসময়ে মুক্তিপণ পরিশোধ

---

* রুদ্রের পুত্রগণ সম্বন্ধে অন্নদামঙ্গলে লিখিত আছে :—

"তিন পুত্র রুদ্রের হবে নিরুপম।
রামচন্দ্র বড় রামজীবন মধ্যম ॥
রামকৃষ্ণ ছোট তার বড় ব্যবহার।
রামচন্দ্র নিধনে রাজাই হবে তার ॥
জিনিবেক সভাসিংহ আদি রাজরাজি।
সোম যাগ করি নাম হবে সোমযাজী ॥
এই কাঁপি হেলন করিবে অহঙ্কারে।
সেই অপরাধে আমি ছাড়িব তাহারে ॥
নিধন করিব তারে দরবারে লয়ে।
রাজ্য দিব রামজীবনেরে তুষ্ট হয়ে ॥"

অন্নদামঙ্গলান্তর্গত মানসিংহ দ্রষ্টব্য।

করিতে না পারায় মুরশিদ কর্ত্তৃক পুনরায় নবরাজধানী মুরশিদাবাদে কারারুদ্ধ হয়েন।

এইকালে আলিমহম্মদ ও কালু জমাদার নামক দুই জন মুসলমান সেনানীর সহায়তায় রাজসাহীর জমিদার উদয়নারায়ণ বিদ্রোহী হইয়া বঙ্গেশ্বরের অধীনতা অস্বীকার করেন। এবং বীরকাটী * নারায়ণগড়, দেবীনগর প্রভৃতি স্থানে দুর্গাদি নির্ম্মাণ করিয়া আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করেন। মুরশিদকুলি খাঁ তাঁহার দমনের নিমিত্ত জহরী-মল্ল প্রমুখ সেনাপতিগণকে প্রেরণ করেন। কৃষ্ণনগরাধিপতি রাম-জীবনের পুত্র অসীম বলশালী যুবরাজ রঘুরাম স্বইচ্ছায় জহরীমল্লের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করেন এবং তথায় স্বীয় বাহুবল ও পরাক্রম প্রকাশ দ্বারা যশস্বী হয়েন। কথিত আছে তাহারই অমোঘ সন্ধানে আলি মহম্মদ † নিহত হইলে পরিণাম চিন্তা করিয়া বিদ্রোহী রাজা উদয়-নারায়ণ সপরিবারে দেবীনগরের হ্রদে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। এইরূপে বিদ্রোহ দমন হইলে নবাব মুরশিদকুলী বিস্তীর্ণ রাজসাহী জমিদারী তাঁহার প্রিয়পাত্র রঘুনন্দনকে প্রদান করেন। রঘুনন্দন তদানীন্তন বঙ্গের সদর কাননগুই দর্পনারায়ণের কর্ম্মচারী ছিলেন। ‡ এই রঘুনন্দন

---

* লুপলাইনে মুরারাই ষ্টেসনের পশ্চিমে মহেশপুরের পূর্ব্ব দক্ষিণে বীরকিটি গ্রাম। ক্ষিতীশ বংশাবলীতে ইহাই বীরকাটি নামে অভিহিত। দেবীনগর অদ্যাপি বর্ত্তমান। এই সকল স্থানে ভগ্নদুর্গের ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি দৃষ্টিগোচর হয়।

† ইতিহাসে ইনি গোলাম মহম্মদ নামেই পরিচিত। এই যুদ্ধ যে স্থানে হইয়া-ছিল তাহাকে এখনও লোকে মুণ্ডমালা বা মুড়মুড়ে ডাঙ্গা বলিয়া থাকে।—বাঙ্গালার ইতিহাস নবাবী আমল।

‡ কথিত আছে নবাব মুরশিদকুলী (তাৎকালীন দেওয়ান জাফর খাঁ) এক সময়ে বাদশাহ দরবারে পেশ করিবার নিমিত্ত নিকাশী কাগজে প্রধানত সদর কাননগুই দর্প-

নাটোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। মুরশিদকুলী খাঁ নদীয়া-রাজকুমার রঘুরামের কৃতকার্য্যের ও বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ তাঁহার পিতা রামজীবনের কারামোচন করিয়া দেন।

এই সময়ে নদীয়ার উত্তর সীমা, "বাঙ্গালী বাহাদুর" সীতারাম রায় ও নবাবী ফৌজের সংঘর্ষে শান্তিহীন হইয়াছিল। সীতারাম নদীয়া সন্নিহিত পরগণা মামুদাবাদে রহিয়া নবাবী ফৌজকে বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন কিন্তু পরিশেষে ধৃত হইয়া মুরশিদ কর্ত্তৃক নৃশংসভাবে সপরিবারে নিহত হয়েন ও তদীয় জমীদারী মুরশিদের আদেশে নদীয়ারাজ রামজীবনকে প্রদত্ত হয়।

রামজীবন তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায়ই সৎক্রিয়ান্বিত ও ধার্ম্মিক ছিলেন। তাঁহার সভায় সর্ব্বদা বহু পণ্ডিতের সমাগম হইত। নদীয়ার সুবিখ্যাত মহাপণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ সার্ব্বভৌম তাঁহার সভার প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। তিনি নিজেও একজন কবি ছিলেন। তাঁহার শেষ জীবন নাটক রচনায় ও নাট্যক্রীড়ায় অতিবাহিত হয়। বৃদ্ধবয়সে পুত্র রঘুরামকে রাজ্য দিয়া ভাগীরথীতীরে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার দুই রাণী প্রথমার গর্ভে গোপাল ও গোবিন্দ জন্মগ্রহণ করেন।* রঘুরাম

নারায়ণের মোহর ছাপ করাইতে চাহিলে দর্পনারায়ণ তাঁহার প্রাপ্য রসুম বাবদ তিন লক্ষ মুদ্রা দাবী করেন এবং উক্ত মুদ্রা না পাইলে কোন মতেই মোহর ছাপ করিবেন না প্রকাশ করেন কিন্তু দেওয়ানের তখন ঐ মুদ্রা সংগ্রহ না হওয়ায় দর্পনারায়ণের কর্ম্মচারী রঘুনন্দনকে প্রলোভনে বশীভূত করিয়া তাঁহার দ্বারা নিকাশী কাগজে কানুনগুর মোহর ছাপ করিয়া লন এই উপকারের প্রত্যুপকার স্বরূপ ভবিষ্যতে মুরসিদকুলী রঘুনন্দনকে রাজসাহী জমিদারী প্রদান করেন।

* কবীন্দ্র ভারতচন্দ্র—রামজীবনের দুই স্ত্রী এবং প্রথমার গর্ভে তিন পুত্র ও দ্বিতীয়ার গর্ভে দুই পুত্রের উল্লেখ করিয়াছেন যথা—

* * * *

সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যদক্ষ, বীর ও প্রজারঞ্জক বিধায় এবং মুরশিদাবাদ দরবারে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি থাকা হেতু রামজীবন মৃত্যুকালে তাঁহাকেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন।

রঘুরাম পিতৃগদীতে অধিরোহন করিয়া দয়া দাক্ষিণ্যাত্যাদি গুণে শীঘ্রই আদর্শ নরপতি বলিয়া খ্যাত হয়েন এবং সৎব্রাহ্মণ ও বিদ্বান ব্যক্তি দেখিয়া শত শত বিঘা ভূসম্পত্তি বৃত্তিস্বরূপ দান করিয়া যান। তিনি হৃদয়বান ও যুদ্ধকুশলী ছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার সাহাসের কথা ইতিপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার শরীরে অমানুষিক শক্তি ছিল এবং সেজন্য সকলেই তাঁহাকে "রঘুবীর" আখ্যা প্রদান করিয়াছিল। তাঁহার খুল্লতাত রামচন্দ্রের বীরত্বগাথার * ন্যায় তাঁহার সম্বন্ধেও বহু বীরত্বগাথা এতদঞ্চলে প্রচলিত আছে।

রঘুরামের যৌবনকালে পত্নী আশুমতীর গর্ভে ১৬৩২ শকে অর্থাৎ ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে তৎপুত্র ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন।

রঘুরাম তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর ত্রয়োদশ বর্ষ রাজত্ব করিয়া ১৬৫০ শকে অর্থাৎ ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে ভাগীরথী তীরে প্রাণত্যাগ করেন।

রাজা রঘুরামের মৃত্যুর পর তাঁহার উপযুক্ত পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে পিতৃগদীতে আরোহণ করেন। কথিত আছে রঘুরাম

"রাজাই করিবে রামজীবন আনন্দে।
তিন পুত্র হবে তার প্রথম ভার্য্যার।
রাজারাম, কৃষ্ণরাম, রঘুরাম রায়।
গোপাল গোবিন্দ হবে অপর ভার্য্যায়।
তার মধ্যে রাজা হবে রঘুরাম রায়।"

* রামচন্দ্রের এই সকল বীরত্বগাথা সংস্কৃত "ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতম্" পুস্তকে বিস্তারিত লিপিবদ্ধ আছে।

তাঁহাকে উত্তরাধিকারী মনোনীত না করিয়া নিজ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রামগোপালকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিয়া যান। কিন্তু পিতার পরলোক হইলে কৌশলী কৃষ্ণচন্দ্র তাম্রকূট অনুরাগী দীর্ঘসূত্রী পিতৃব্যকে কৌশলে পথিমধ্যে তাম্রকূট সেবনে নিরত রাখিয়া স্বয়ং যাইয়া তৎপূর্ব্বে নবাব দরবারে উপস্থিত হয়েন এবং আপনার নামে জমিদারীর ফারমন লইয়া বাহিরে আসিলে রামগোপালের চৈতন্যোদয় হয়; তখন তিনি ব্যস্ত হইয়া নবাব সমীপে উপস্থিত হইলে নবাব তাঁহাকে অসার ও অপদার্থ জ্ঞানে বিদায় দেন।*

বাল্যকাল হইতে কৃষ্ণচন্দ্র অসাধারণ মেধাবী ও শক্তিশালী ছিলেন। তিনি অল্পদিনের মধ্যেই সংস্কৃত ও পারশী প্রভৃতি ভাষায় সবিশেষ ব্যুৎপন্ন হয়েন। এতদ্ব্যতীত তিনি তাঁহার পদের উপযুক্ত নানাবিধ বিদ্যা ও নীতিশিক্ষা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি কালিদাস সিদ্ধান্ত নামক এক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত ভাষা, কালোয়াৎ বিশ্রামখাঁর নিকট সঙ্গীত শাস্ত্র এবং মুজাফার হুসেনের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই মুজাফার হুসেন নবাব মুরশিদকুলি খাঁর ভাগিনেয়। কোন কারণে ক্রোধ করিয়া তিনি মুরশিদাবাদ ত্যাগ পূর্ব্বক নদীয়া রাজসভায় আগমন করেন। নদীয়াধিপতিও প্রচুর পরিমাণে মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়া পরম সমাদরে তাঁহাকে নিকটে রাখেন।

সুকবি ভারতচন্দ্র তাঁহার অন্নদামঙ্গল গ্রন্থে কৃষ্ণচন্দ্রকে কলাবিদ্যা-বিশারদ, প্রিয়দর্শন, কালীভক্তিপরায়ণ বলিয়া এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন;—

---

* দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় প্রণীত ক্ষিতিশ বংশাবলী চরিত, একাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

নিবেদনে অবধান কর সভাজন।
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভার বিবরণ॥
চন্দ্রে সবে ষোল কলা * হ্রাস বৃদ্ধি তায়।
কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষট্টি কলায়॥ †

---

* চন্দ্রকলা, ষোলকলায় পূর্ণ হইলে পূর্ণচন্দ্র হয়।

† শিবতন্ত্রোক্ত চতুঃষষ্টিকলা, যথা—গীত ১। বাদ্য ২। নৃত্য ৩। নাট্য ৪। আলেখ্য ৫। বিশেষকচ্ছেদ ৬। অণ্ডুল কুসুমবলি বিকার ৭। পুষ্পাস্তরণ ৮। দশন বসনাঙ্গরাগ ৯। মণিভূমিকাকর্ম্ম ১০। শয়ন রচন ১১। উদক বাদ্য ১২। উদকঘাত ১৩। চিত্রযোগ ১৪। মাল্য গ্রথমবিকল্প ১৫। শেখরাপীড়নযোজন ১৬। নেপথ্যযোগ ১৭। কর্ণপত্রভঙ্গ ১৮। গন্ধযুক্তি ১৯। ভূষণযোজন ২০। ইন্দ্রজাল ২১। কৌচমার যোগ ২২। হস্ত লাঘব ২৩। চিত্র-শাকপূপভক্ষ্যবিকার ক্রিয়া। ২৪। পানবরসরাগাসবযোজন। ২৫। সূচীবাপ কর্ম্মণি ২৬। সূত্রক্রীড়া ২৭। প্রহেলিকা ২৮। প্রতিমালা ২৯। দুর্ব্বচক যোগ ৩০। পুস্তকবাচন ৩১। নাটিকাখ্যায়িকা দর্শন ৩২। কাব্যসমস্যা পূরণ ৩৩। পট্টিকাবেত্রবাণ বিকল্প ৩৪। তকুকর্ম্মণি ৩৫। তক্ষণ ৩৬। বাস্তুবিদ্যা ৩৭। রূপ্যরত্নপরীক্ষা ৩৮। ধাতুবাদ ৩৯। মণিরাগজ্ঞান ৪০। আকার জ্ঞান ৪১। বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ যোগ ৪২। মেষকুক্কুটশাবক যুদ্ধবিধি। ৪৩। শুকসারিকা প্রলাপন ৪৪। উৎসাদন ৪৫। কেশমার্জ্জন কৌশল ৪৬। অক্ষরমুষ্টিকা কথন ৪৭। ম্লেচ্ছিত কবিকল্প ৪৮। দেশভাষাজ্ঞান ৪৯। পুষ্পশকটিকা ৫০। যন্ত্রমাতৃকা ৫১। ধারণ মাতৃকা ৫২। সংপাট্য ৫৩। মানসীবাক্য ক্রিয়া ৫৪। ক্রিয়া বিকল্প ৫৫। ছলিতক যোগ ৫৬। অভিধানকোষ ছন্দজ্ঞান ৫৭। বস্ত্র গোপনানি। ৫৮। দ্যূতবিশেষ ৫৯। আকর্ষক্রীড়া ৬০। বালক ক্রীড়নক ৬১। বৈনায়িকী দিব্যজ্ঞান ৬২। বৈজয়িকী বিদ্যাজ্ঞান ৬৩। বৈতালিকী বিদ্যাজ্ঞান ৬৪। ইতি শব্দার্থমুক্তাবলী।

পদ্মিনী মুদয়ে আঁখি চন্দ্রেরে দেখিলে।
কৃষ্ণচন্দ্রে দেখিতে পদ্মিনী আঁখি মিলে॥
চন্দ্রের হৃদয়ে কালী কলঙ্ক কেবল।
কৃষ্ণচন্দ্র হৃদে কালী সর্ব্বদা উজ্জ্বল॥ *

কবিবর চারুচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রকে পুনঃ পুনঃ চতুঃষষ্ঠি কলা বিদ্যাবিশারদ উল্লেখ করায় ইহা যে কবিজনসুলভ প্রশংসা বাক্য বলিয়া মনে হয় না। মহারাজা প্রকৃতই ঐ সকল বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার জীবনী আলোচনা করিলে স্বতই মনে হইবে। এরূপ প্রবাদ আছে মহারাজা ভারত চন্দ্রের ভাবময়ী কবিতায় মুগ্ধ হইয়া যখন তাঁহাকে "রায় গুণাকর" উপাধি প্রদান করেন, তখন সুকবি ভারত তাঁহাকে নিম্নলিখিত কবিতা দ্বারা অভিনন্দিত করেন,—

"নিষ্কলঙ্কো নিরাতঙ্কঃ পদ্মিনী প্রাণবল্লভ।
চতুঃষষ্টি কলঃ কৃষ্ণচন্দ্রো ভাতি সদা ভুবি॥"

অর্থাৎ, আকাশের চন্দ্রে কলঙ্ক দেখা যায় ও তাহাতে রাহুগ্রস্ত হইবার আতঙ্ক আছে এবং তাহার পদ্মপুষ্পের সহিত অপ্রণয় দেখা যায় কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রে কলঙ্ক নাই, তিনি সর্ব্বত্র আতঙ্ক বিরহিত এবং পদ্মিনী জাতীয়া শ্রেষ্ঠা নারীগণের চির বাঞ্ছনীয়। আকাশের চন্দ্রে মাত্র ষোড়শ কলা তাহাও হ্রাস প্রাপ্ত হয় কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র চৌষট্টি কলা পূর্ণ ও তাহাতে কখন হীনতা নাই, আকাশের চন্দ্র দিবা ভাগে ও কৃষ্ণপক্ষে অদৃশ্য হয়েন কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র কি দিবা কি রাত্রি, কি শুক্ল কি কৃষ্ণপক্ষ সকল কালেই বিরাজমান আছেন। আকাশস্থ চন্দ্র আকাশে থাকায় দুর্লভ কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র পৃথিবীপৃষ্ঠে থাকায় সকলেরই পক্ষে সুলভ।

* চন্দ্রোদয়ে রাত্রিকালে পদ্মিনী (পুষ্প) মুদিত হয়, কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রকে দর্শন করিতে পদ্মিনী (শ্রেষ্ঠা নারী সকল) উদ্‌গ্রীব হয়। চন্দ্রের বক্ষঃস্থিত কালী তাহার কলঙ্কব্যঞ্জক কিন্তু ভক্ত কৃষ্ণচন্দ্রের হৃদয়ে জগজ্জননী-মূর্ত্তি সর্ব্বদা উজ্জ্বল। কালীময় ঘটক প্রণীত চরিতাষ্টক দ্রষ্টব্য।

কৃষ্ণচন্দ্র যখন এইরূপে সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ হইয়া উঠিলেন তখন তাঁহার পিতা মহারাজা রঘুরাম রায় জীবিত। তিনি পুত্রের বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত দেখিয়া, তাঁহাকে বিষয়কার্য্য শিক্ষার্থ অমাত্যগণকে আদেশ করিলেন। মহা মেধাবী কুমার অল্পদিনের মধ্যে পারশী ও আরবী প্রভৃতি ভাষা আয়ত্ত করিয়া রাজনীতি বিদ্যাও অভ্যাস করিয়া একজন কূটরাজনীতিজ্ঞ বলিয়া পিতার ন্যায় খ্যাত হইলেন। পরম মেধাবী কুমারের ভবিষ্যৎ জীবনে পদে পদে আমরা এই কূটনীতি জ্ঞানের পরিচয় প্রাপ্ত হই।

বৃদ্ধ মহারাজা এইরূপে কুমারকে সর্ব্বগুণসম্পন্ন ও সর্ব্বশাস্ত্র-পারদর্শী দেখিয়া কুমারের বিবাহ দিতে মনস্থ করিলেন; এবং অন্বেষণ মতে বাহুলে গ্রামস্থিত রামকৃষ্ণ নামক এক সদ্ব্রাহ্মণের দশম বর্ষীয়া পদ্মানাম্নী সর্ব্ব-সুলক্ষণা কন্যার সহিত মহাসমারোহে কুমারের বিবাহ দিলেন। এই বিবাহে রঘুরাম বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন এবং দেশ বিদেশ হইতে বহু রাজা, রাজপুত্র, পণ্ডিত ও মান্যগণ্য ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

পিতার মৃত্যুর পর মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র যৌবনে স্বয়ং দেখিয়া একটী বিবাহ করেন। এই ছোট রাণীর বিবাহ সম্বন্ধে একটী মনোরম আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে। রাণাঘাটের এক মাইল উত্তর পূর্ব্বে নোকাড়ী বলিয়া একখানি বহু প্রাচীন গ্রাম বিদ্যমান আছে। উহার দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া "বায়কো" নামক অধুনা বদ্ধ সলিলা চূর্ণী নদীর একটী শাখা আছে। পূর্ব্বে ঐ খাদে একটী বেগবতী নদী বহতা ছিল। একদা রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এই নদী দিয়া তাঁহার শ্রীনগরস্থ প্রাসাদে গমনকালে নোকাড়ীর ঘাটে এক অনিন্দ্য সুন্দরী অনূঢ়া ব্রাহ্মণ কন্যাকে জলক্রীড়া করিতে দেখিয়া তাঁহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ঐ কন্যার পিতাকে আহ্বানপূর্ব্বক কন্যাটীর পাণিপ্রার্থী হইলে ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন "মহারাজ! আপনি আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেন ইহা আমার পক্ষে শ্লাঘার বিষয়, কিন্তু আপনি কেশর গাঁই রাঢ়ীয়

ব্রাহ্মণ * আমার স্বশ্রেণীর ও পালটী ঘর নহেন এক্ষেত্রে আপনাকে কন্যা-দান করিলে আমার স্বশ্রেণীর মধ্যে আমাকে হীন হইতে হইবে।" যাহা হউক, পরিশেষে ব্রাহ্মণের সে আপত্তি রহিল না। রাজা সেই কন্যাকে বিবাহ করিয়া স্বীয় প্রাসাদে লইয়া আসিলেন এবং নিশীথে বাসর-গৃহে নবপ্রণয়িনীকে রজত পর্য্যঙ্কে শয়ন করাইয়া রাজা কহিলেন "দেখ আমাকে বিবাহ করিয়া তুমি রূপার খাটে শয়ন করিলে।" তেজস্বিনী রাজমহিষী উত্তর করিলেন—"আর একটু উত্তরে যাইলে সোনার খাটে শয়ন করিতে পারিতাম।" ইহার তাৎপর্য্য এই আমার পিতা পরম কুলীন হইয়া যখন কেশর গাঁই মহারাজকে কন্যা দিলেন তখন আর একটু হীনতা স্বীকার করিয়া মুরশিদাবাদের নবাবের সহিত বিবাহ দিলে স্বর্ণ পালঙ্কে শয়ন করিতে পারিতাম। মহারাজা স্ত্রীর এই তেজগর্ভ স্পষ্ট উত্তর শ্রবণ করিয়া যারপরনাই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। এই রাণীর গর্ভে কুমারও তাঁহার ন্যায় তেজস্বী হইয়াছিলেন। কথিত আছে এই বিবাহের ফল মহারাজার কি দাম্পত্য জীবনে কি বৈষয়িক ব্যাপারে কোথাও বিশেষ সুখকর হয় নাই।

কৃষ্ণচন্দ্রের প্রথম বিবাহের কিয়ৎকাল পরেই রাজা রঘুরাম প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর কৃষ্ণচন্দ্র রাজ্যাধিকার করেন। এই সময়ে নদীয়া রাজ্য অতি বিস্তীর্ণ আকার ধারণ করিয়াছিলেন! সমগ্র অধিকার

---

* পূর্ব্বপুরুষের কোন সময়ে কেশর গ্রামে বাস ছিল বলিয়া ইহাঁদের "কেশরী গাঁই" প্রসিদ্ধি যথা "অন্নদামঙ্গল" গ্রন্থে ভবানন্দের জন্মবৃত্তান্ত অধ্যায়ে,

"তাহে রাম সমাদ্দার নামে একজন!
শ্রোত্রীয় কেশর গাই রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ॥

মোট চৌরাশী পরগণায় বিভক্ত ছিল। এই সকল পরগণা প্রায়শঃ খাসে বিভিন্ন তালুকদারগণের অধিকারভুক্ত ছিল এবং দেশের সর্ব্ববিধ বিচার-কার্য্য রাজকর্ম্মচারীগণ কর্ত্তৃক বা তালুকদার কর্ত্তৃক সমাহিত হইত। মহারাজা স্বয়ং হিন্দু পণ্ডিত ও মুসলমান কাজী ও মৌলবীর সাহায্যে ন্যায়ানুমোদিত বিচার সাধন করিতেন। তিনি প্রতিদিন কোনও নির্দ্দিষ্ট সময়ে বিচারার্থীগণের বিচার করিতেন। স্বত্বের বিচারের ভার ছিল তাঁহার দেওয়ানের উপর; কিন্তু তাহার চূড়ান্ত আদেশ দিতেন তিনি। তাঁহার ফৌজদার অন্যান্য অপরাধের বিচার করিতেন। এই উভয় প্রকারের মামলার প্রয়োজন মতে পুনর্ব্বিচার করিতেন তিনি স্বয়ং, সুতরাং বিচার তখন সুলভ হইলেও সূক্ষ্মতার কোনওরূপ ন্যূনতা ছিল না। রাজা অবিচার করিলে তাঁহার বিরুদ্ধে নবাবের নিকট আবেদন হইতে পারিত, কিন্তু জলে বাস করিয়া কুমীরের সঙ্গে বিবাদে কেহ সাহস করিত না। চৌর্য্য অপরাধে বিবিধ শারীরিক দণ্ড প্রযুক্ত হইত। রাজধানীতে রীতিমতন "কয়েদখানার" ব্যবস্থা ছিল। মহারাজের অধীনে বদরুদ্দিন নামক জনৈক কাজী ছিলেন। কথিত আছে, এই কাজীর মাতৃবিয়োগ হইলে মাতার পারলৌকিক কার্য্য সাধনার্থ তিনি মহারাজের নিকট কিয়দ্দিবসের নিমিত্ত অবকাশ প্রার্থনা করিলে, মহারাজা তাঁহাকে বিদায় দিয়া তাঁহার মাতৃকার্য্যে গোহত্যা করিতে নিষেধ করেন এবং তাহার স্থলে ছাগ ও মহিষ বধে অনুজ্ঞা দেন। কাজী সম্মত হইয়া বাটী আগমন করতঃ মহিষান্বেষণে বহু লোক নিযুক্ত করেন; কিন্তু নির্দ্দিষ্ট দিনে মহিষ আসিয়া না পৌছানয়, তাঁহার আত্মীয় স্বজনের প্ররোচনায় গোহত্যা করিতে বাধ্য হন। মহারাজ স্বীয় অধিকার মধ্যে আপনার ভৃত্য কর্ত্তৃক এইরূপে গোহত্যা-কাহিনী শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া ঐ কাজীর মুখ-দর্শন করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েন এবং তাঁহার আবাস লুণ্ঠনে

আদেশ দেন। রাজসভায় রাজার প্রিয় জমাদার জাফর খাঁ * কাজীর বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তিনি রাজার আদেশ শ্রবণ মাত্র গোপনে কাজীকে সপরিবারে গ্রামত্যাগে পরামর্শ পাঠাইয়া, সতর্ক করিয়া দেওয়ায় রাজ-ভৃত্যগণ যখন কাজীর আবাস লুণ্ঠনে আসিল, তখন সমস্ত গ্রাম অনুসন্ধানে কাজীর সন্ধান না পাইয়া, তাহার শূন্য আবাস দগ্ধ করিয়া তাহারা রাজসন্নিধানে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। কাজী ইতিমধ্যে বসিরহাটে কুটুম্বগৃহে

---

* অন্নদামঙ্গল গ্রন্থে এই রাজসভা বর্ণনা স্থলে এই জমাদার জাফর খাঁ সম্বন্ধে লিখিত আছে,—

"সেকাহীর জমাদার মামুদ জাফর।
জগন্নাথ সিরোপা করিল যাহার পর।

প্রবাদ জাফর পশ্চিমদেশীয় মুসলমান হইলেও নদীয়া রাজের সংসর্গে আসিয়া পরম সাধক হয়েন এবং জগন্নাথ মন্ত্রোপাসক হয়েন। একদিন শিবনিবাসের রাজ সন্নিধানে দাঁড়াইয়া থাকিবার কালীন সহসা অত্যন্ত ব্যস্ততা প্রকাশ করায় ও পরিধেয় বস্ত্রাদি পুনঃ পুনঃ ঝাড়িতে থাকায় সকলে উহার কারণ জানিতে উৎসুক হইলে তিনি প্রকাশ করেন যে "শ্রীধাম পুরীতে প্রভুর বস্ত্রে অগ্নি সংযোগ হওয়ায় নিভাইয়া দিলাম। রাজা উক্ত জাফরের এই অলৌকিক কাহিনী শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ পুরীতে ইহার তথ্যানুসন্ধানে লোক পাঠাইয়া উপযুক্তকালে সন্ধান পান যে সত্যই সে দিন ঠিক সেই সময়ে ঠাকুরের বস্ত্রে অগ্নিসংযোগ হয় এবং জাফরের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট এক ব্যক্তি উহা নির্ব্বাণ করেন। এই জমাদারের সমাধি অদ্যাপি শিবনিবাসে বাত্রা বাটীর সন্নিকট বিদ্যমান রহিয়াছে ও এখানে হিন্দু মুসলমান সর্ব্ব জাতি ভক্তিভরে পূজা মানত করিতেছে। তখন এই রাজসংসারে জমাদারের পদ অতি সম্মানের ছিল। পরবর্ত্তীকালে জাফর খাঁর মৃত্যুর পর আমরা ভৈরব সিং নামক একজন হিন্দুকে এই পদে দেখিতে পাই।

অজ্ঞাতবাস করিতে থাকেন এবং গোপনে জমাদার জাফর খাঁকে রাজ-সন্নিধানে উপযুক্ত অবসরে তাঁহার পক্ষে ওকালতী করিয়া রাজার ক্রোধোপ-নোদন চেষ্টা করিতে অনুরোধন করেন। মহারাজা সর্ব্বদা ন্যায়বিচারের পক্ষপাতী ছিলেন। প্রধান মৌলবী বিহনে মুসলমানদের বিচারে সর্ব্বদাই তাঁহার সন্দেহ হইতে লাগিল। একদিন এবম্বিধ সন্দেহাকুলিত চিত্তে যখন উপবিষ্ট ছিলেন, তখন তাঁহার প্রিয় জমাদার সুযোগ বুঝিয়া কাজীর জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করেন! তাহাতে মহারাজ সেই বারে ক্ষমা করেন বটে কিন্তু তাহার মুখদর্শন করিবেন না বলিয়া পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করায় কাজীর উপযুক্ত পুত্রকে ঐ কার্য্যে মনোনীত করিয়া তাঁহাদের অনুসন্ধান করিতে আদেশ দেন। জমাদার পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাদের সন্ধান অবগত ছিলেন, এক্ষণে সুযোগ পাইয়া অবিলম্বে তাঁহাদের এই শুভবার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন ও তাঁহাদের দেশে ফিরিয়া আসিতে বলিয়া পাঠাইলেন।

মহারাজার বিস্তীর্ণ জমিদারীর অসংখ্য মুসলমান প্রজার তাহাদের শাস্ত্রানুমোদিত সূক্ষ্মবিচার কার্য্যের জন্য যেমন শিক্ষিত কাজী ও মৌলবী-গণ নিযুক্ত ছিলেন তেমনি হিন্দুপ্রজাগণের বিবাদ নিষ্পত্তি ও বিচার কার্য্যের জন্য তাৎকালীক প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ নিযুক্ত ছিলেন। ইহাঁদের সকলের বিচারের শেষ মীমাংসার্থ মহারাজ স্বয়ং কয়েকজন সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী পণ্ডিত লইয়া বিচারকার্য্য সম্পন্ন করিতেন। এই সকল পণ্ডিতগণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার রামানন্দ বাচস্পতি ও গোপাল ন্যায়লঙ্কার, বীরেশ্বর পঞ্চানন প্রভৃতি কয়েক জনের নাম সবিশেষ প্রসিদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার জীমূতবাহন কৃত দায়ভাগের টীকা ও "দায়ক্রমসংগ্রহ" নামক দায়ভাগ সংক্রান্ত এক গ্রন্থ রচনা করেন। সুপ্রসিদ্ধ কোলব্রুক সাহেব এই দায়ক্রম সংগ্রহ পুস্তক ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়াছেন।

রামানন্দ বাচস্পতি আহ্নিক আচার নামক গ্রন্থ লিখিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। হিন্দুসমাজে বর্ত্তমানকালে যে ভাবে আহ্নিকাদি সম্পন্ন করিবার ব্যবস্থা প্রচলিত তাহা এই পুস্তকেরই মতানুযায়ী।

গোপাল ন্যায়লঙ্কার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভার অন্যতম উজ্জ্বল রত্ন। ইঁহার পূর্ণ নাম রামগোপাল ন্যায়লঙ্কার, নিবাস নবদ্বীপ। ইনি উদ্বাহ, আচার, তিথি, দায়, সম্বন্ধ, শুদ্ধি, প্রায়শ্চিত্ত, দুর্গোৎসব প্রভৃতি কয়েকখানি নির্ণয় গ্রন্থ রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। কথিত আছে ঢাকার শাসনকর্ত্তা রাজা রাজবল্লভ স্বীয় বালবিধবা কন্যার পুনর্বিবাহ দিবার পক্ষে বহু পণ্ডিতের মত প্রাপ্ত হইয়া নদীয়া সমাজের পণ্ডিতগণের নিকট হইতে ব্যবস্থা সংগ্রহের নিমিত্ত নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রকে অনুরোধ করেন ও কতিপয় পণ্ডিতকে তাঁহার সভায় প্রেরণ করেন। কৃষ্ণচন্দ্র বহু বিষয়েই রাজা রাজবল্লভের মুখাপেক্ষী ছিলেন সুতরাং এ বিষয়ে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হয়েন। কিন্তু এই গোপাল ন্যায়লঙ্কারের অকাট্য যুক্তি ও প্রমাণবলে বিধবাবিবাহ যে অশাস্ত্রীয় ও সম্পূর্ণরূপে যে দেশকাল পাত্রানুপযুক্ত তাহা প্রতিপন্ন হয়। কথিত আছে সুকৌশলী রাজা কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং প্রকাশ্যে পণ্ডিতগণকে বিধবাবিবাহের অনুকূলে মত দিতে অনুরোধ করেন, এমন কি শাসনবাক্য প্রয়োগ করিলেও গোপনে তাঁহাদের অমত প্রকাশে দৃঢ়তা দেখাইতে উপদেশ দিয়া রাজবল্লভকে হতাশ করিয়াছিলেন। * এই কালেই মহানন্দ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী

* এই সম্বন্ধে একটী কৌতুকাবহ কিম্বদন্তী এতদঞ্চলে প্রচলিত আছে; শুনা যায় রাজবল্লভের প্রেরিত পণ্ডিতগণের নিকট রাজবাটী হইতে যে সিধা প্রেরিত হয় উহার সহিত একটী মহিষ শাবক প্রেরিত হয়। পণ্ডিতগণ উক্ত মহিষ শাবকটী দর্শনে কুপিত হইয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রাজকর্ম্মচারীরা নিবেদন করেন যে যখন কোন কোন শাস্ত্রে মহিষ মাংস ভক্ষণের আদেশ প্রদত্ত

বাঙ্গলার শাসন ও কিয়ৎ পরিমাণে বিচারভার নিজেদের হস্তে লইয়াছিলেন কিন্তু বিচার সম্বন্ধে হিন্দুর ব্যবস্থায় তাঁহারা একেবারে অজ্ঞ ছিলেন, সুতরাং স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণের সহয়তা একান্ত প্রয়োজন হয়। এই গোপাল ন্যায়লঙ্কারই প্রথম মাসিক বৃত্তি অবধারণে গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক নিযুক্ত হয়েন। ইঁহার পর বীরেশ্বর ন্যায় পঞ্চানন এই পদে নিযুক্ত হয়েন।* বীরেশ্বর পঞ্চানন কৃষ্ণচন্দ্রের সভার অলঙ্কারস্বরূপ

হইয়াছে তখন উহা গ্রহণে কি আপত্য হইতে পারে। রাজবল্লভের পণ্ডিতগণ উত্তর করেন "হাঁ যদিও কোন কোন শাস্ত্রে এরূপ ব্যবস্থা আছে বটে কিন্তু এদেশে মহিষ মাংস ভক্ষণের ব্যবস্থা নাই সুতরাং উহা অভ্যক্ষ" সুশিক্ষিত রাজকর্ম্মচারীগণ তখন সাহ্লাদে বলিলেন "যখন শাস্ত্রসম্মত স্বীকার করিয়াও ব্যবহার বিরুদ্ধ বলিয়া ইহা অভক্ষ্য বলিতেছেন তখন অপ্রচলিত দেশাচার বিরুদ্ধ বিধবাবিবাহে আপনারা কিরূপে মত প্রকাশ করিলেন ও পরে গোপাল ন্যায়লঙ্কারের নিকট বিচারে পরাস্ত হইয়া নিজেদের মত পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

* সদাশয় ইংরাজরাজ এদেশ অধিকার করিয়া যখন আইন কানুন প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করেন তখন হিন্দুগণের আচার ব্যবহার অব্যাহত রাখিতে তাঁহাদেরই দেশপ্রচলিত ও শাস্ত্রানুমোদিত তাঁহাদের আইন কানুন প্রনয়ণে যত্নবান হয়েন এবং লর্ড হেষ্টিংস্ সাহেব কর্ত্তৃক বঙ্গের বিভিন্ন ব্রহ্মদেশস্থ একাদশ জন পণ্ডিতের তত্ত্বাবধানে সমস্ত স্মৃতিশাস্ত্র মন্থন করিয়া "বিবাদার্ণব সেতু নামক এক মহাগ্রন্থ লিপিবদ্ধ হয়। এই একাদশ জন পণ্ডিতের মধ্যে নবদ্বীপের রামগোপাল ন্যায়লঙ্কার ও বীরেশ্বর পঞ্চানন এই দুইজনের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। সমগ্র ব্যবহার শাস্ত্র মধ্যে এরূপ মূল্যবান গ্রন্থ আর নাই তখন ইংরাজি ও সংস্কৃত উভয় ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিতের অভাব বশতঃ উহা প্রথমতঃ পারশি ভাষায় অনুদিত পরে মিঃ হাল্‌হেড কর্ত্তৃক ইংরাজিতে অনুবাদিত হইয়া Code of Geutoodaw নামে ইংলণ্ডে ছাপা

ছিলেন। তাঁহার সর্ব্বশাস্ত্রদর্শিতা ও কুশাগ্র বুদ্ধি তাঁহাকে তদানীন্তন পণ্ডিত সমাজে শীর্ষস্থান দিয়াছিল। কিন্তু কি কুগ্রহের ঘোরে জানি না তাঁহার "দৈত্য বীরেশ্বর" বলিয়া খ্যাতি হয়। কথিত আছে পণ্ডিত মহাশয় একদা তাঁহার কোনও এক ভৃত্যের উপর অতিশয় ক্রোধ পরায়ণ হইয়া তাহাকে একটী চপেটাঘাত করেন এবং সেই একমাত্র চপেটাঘাতেই ভৃত্যটী প্রাণত্যাগ করে। এই আকস্মিক ও অভাবনীয় ঘটনায় পণ্ডিত অতিমাত্র ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হইয়া মহারাজার শরণাপন্ন হয়েন। মহারাজাও সবিশেষ তথ্য লইয়া দেখিলেন যে ভৃত্যকে হত্যা করা ব্রাহ্মণের অভিপ্রেত ছিল না সহসা উত্তেজিত হইয়া চড় মারায় এই বিপত্তি সংঘটিত হইয়াছে। তাই সে যাত্রা তাঁহার কৃপায় ব্রাহ্মণ অব্যাহতি পাইলেন বটে কিন্তু মহারাজ বলিলেন—"পণ্ডিত! আপনার কার্য্যটী দৈত্যের স্থায় হইয়াছে। তদবধি তিনি "দৈত্য বীরেশ্বর" ও তদীয় বংশধরেরা দৈত্য আখ্যা প্রাপ্ত হন। সেকালে কোনও লঘু পাপের শাস্তি দিতে হইলে কুক্রিয়াশীল ব্যক্তির নামের সহিত উক্ত কার্য্যের যোগ করা হইত। এইরূপ শুনা যায় যে একবার কোনও এক ব্যক্তি প্রাতঃকালে মুখ প্রক্ষালন না করিয়াই বাসি মুখে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় উপস্থিত হয়। রাজা তাহার শ্লেষ্মা ও লালাসংলিপ্ত মুখ দর্শনে তাহাকে বাসিমুখো বলিয়া সম্বোধন করেন; তদবধি ঐ ব্যক্তি

হয়। ঐ পুস্তকে ১১ জন পণ্ডিতের নাম দেওয়া যায়। ১। বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার। ২। কৃপারাম তর্কসিদ্ধান্ত। ৩। রামগোপাল স্থায়লঙ্কার। ৪। কৃষ্ণজীবন স্থায়লঙ্কার। ৫। বীরেশ্বর পঞ্চানন। ৬। কৃষ্ণচন্দ্র সার্ব্বভৌম। ৭। গৌরীকান্ত তর্কসিদ্ধান্ত। ৮। কৃষ্ণকিশোর তর্কালঙ্কার। ৯। কালীশঙ্কর বিদ্যাবাগীশ। ১০। শীতারাম ভাট।

"বাসিমুখো" নামে খ্যাত হয়। ইঁহাদের বংশ শান্তিপুরে অদ্যাপি বর্ত্তমান ও প্রাচীনগণের নিকট উক্ত নামে পরিচিত।

মহারাজার দরবারে বিচারকার্য্যে সহৃদয়তার পরিচয়ের বহু দৃষ্টান্ত প্রবাদস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। স্থান, কাল, পাত্র ও উদ্দেশ্যাদি বিবেচনা করিয়া যথোপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা হইত। সময়ে সময়ে গুণগ্রাহী কৌতুকী রাজার নিকটে দোষী ব্যক্তিও যথোপযুক্ত প্রত্যুত্তর দিয়া তিরস্কারের স্থলে পুরস্কার লাভ করিত। আবার বিচার উপলক্ষে কখনও কখনও রাজসভায় নানা কৌতুকের অবতারণাও হইত; কৌতুকী মহারাজা যথোচিত উত্তর প্রাপ্তির আশায় সর্ব্বদা নানা কৌতুক কথার অবতারণা করিতেন।

কোনও সময়ে মহারাজার স্থাপিতা কোন দেবী মূর্ত্তির মস্তকস্থিত একখানি বহুমূল্য রত্নাদি খচিত স্বর্ণ মুকুট অপহৃত হইলে হর নামক পরিচারক ব্রাহ্মণের উপর সকলের সন্দেহ পতিত হয় এবং বিচারে মহারাজা তাহার প্রতি কোনও কঠিন দণ্ডের আদেশ দেন। ব্রাহ্মণ অনন্যোপায় হইয়া মহারাজার অন্যতম সভাসদ বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের শরণাপন্ন হইলে সুকবি বিদ্যালঙ্কার মহাশয় মহারাজাকে নিম্নলিখিত শ্লোকটী লিখিয়া পাঠান,—

"জলে লবণবল্লীনং মানসং তন্মনোহরম্।
মনোজিহীর্ষয়া দেব্যাঃ কিরীটং হরতে হরঃ॥*

---

* টীকা—মানসং মদীয়ং ইতি শেষঃ জলে লবণবৎ দেব্যাস্থলীনং তন্ময়ং আসীৎ। অতস্তৎ প্রতিহর্ত্তুম্ ন শক্নোমি, ইতি পরাভবং প্রতিকর্ত্তুং হরঃ মহাদেবঃ (পক্ষে) হর নামকঃ পুরোহিতঃ দেব্যা মনোজিহীর্ষয়া চিত্তং হর্ত্তুমিচ্ছয়া তন্মনোহরং তস্যা দেব্যা মনোহরং চিত্তাকর্ষকং কিরীটং মুকুটং হরতে চোরয়তি।

ভাবার্থ—যেমন জলে লবণ পড়িলে তাহা সর্ব্বতোভাবে জলেই লীন হয় তেমনি হরের মন দেবীর উপর পড়িয়া তাহাতেই তন্ময়ত্ব লাভ করিয়াছিল এবং দেবীও আর উহা হরকে ফেরত না দিলে হর মনে মনে চিন্তা করিলেন যে আমিও তবে দেবীর মনটী চুরী করিয়া লই। কিন্তু চুরি করিতে যাইয়া দেখিলেন যে দেবীর মন আর তখন দেবীতে নাই তাহা তাঁহার মস্তকস্থিত মহামূল্য সুগঠিত মুকুটে সংস্থাপিত তাই অনন্যোপায় হইয়া মুকুটের জন্য নহে মনের জন্যই হর দেবীর মুকুটখানি লইয়াছে।"

শুনা যায় গুণগ্রাহী মহারাজ বিদ্যালঙ্কারের এই ভাবময় ভক্তি ও কৌতুক বিমিশ্রিত অপূর্ব্ব কবিতা পাঠে ব্রাহ্মণের দণ্ডের লাঘব করেন।

অপর একদিন রাজা নগর ভ্রমণে বাহির হইয়া এক স্থানে দেখিলেন এক দেবল-ব্রাহ্মণ শালগ্রাম শিলা লইয়া যাইতে যাইতে পথিমধ্যে ঠাকুর লইয়াই মূত্রত্যাগে বসিল। নিজাধিকার মধ্যে দেববাহী ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক এইরূপে অনাচার প্রত্যক্ষ করিয়া মহারাজ নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ ঐ ব্রাহ্মণকে রাজসভায় লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। এই অপ্রত্যাশিত বিপদে ব্রাহ্মণ প্রমাদ গণিল কিন্তু তখন আর উপায় কি, তাই সে একমনে বিপদবারণ মধুসূদনের চিন্তা করিতে লাগিল। রাজা সভানীত ঐ দোষী ব্রাহ্মণকে যখন অত্যন্ত ধিক্কার দিলেন ও তিরস্কার করিলেন ও প্রত্যুত্তরে তাহার কিছু বলিবার আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন তখন ঐ ব্রাহ্মণ করযোড়ে নিবেদন করিল ঠাকুর। আমার দোষ অমার্জ্জনীয় কিন্তু আমার পোষকে এইমাত্র বলিবার আছে যে আপনি স্বয়ং যখন অশ্বারোহণে ভ্রমণ করেন, তখন ঐ অশ্বের যদি মল মূত্র বেগ আসে তবে কি আপনাকে পৃষ্ঠ হইতে নামাইয়া সে উহা সম্পাদন করে। আমরা বিশেষ দেবল-ব্রাহ্মণ দেবতার অশ্ব, স্থানান্তরে যাইতে

হইলে এই দেবল ভিন্ন শিলাময় বিগ্রহের গত্যান্তর নাই সুতরাং যদি ঠাকুরের অশ্ব ঠাকুরকে পৃষ্ঠে লইয়া মলমূত্র ত্যাগে দোষী না হয় তবে এই দেব-অশ্ব ঐরূপ ব্যবহার করিয়া এমন প্রমাদে কেন পড়িবে ?” ব্রাহ্মণের বাক্যে সভামধ্যে হাস্যরোল উঠিল এবং রাজাও তাহাকে বিটল ব্রাহ্মণ বলিয়াই শাস্তির শেষ করিলেন।

আর একদিন রাজা শুনিলেন হরিঘোষ নামক গোপের অসংখ্য গাভীর মধ্যে একটী সুরভী নাম্নী কামধেনু জাতীয়া গাভী আছে এবং ধনে বা অনুরোধে কিছুতেই সে সেই গাভী হস্তান্তর করিতে প্রস্তুত নহে তাই রাজা একদিন হরিঘোষকে স্বয়ং ডাকিয়া পরদিন উৎকৃষ্ট দধি প্রস্তুত করিয়া দিতে বলিলেন। গোপও মহা হৃষ্ট মনে তাহার সাধ্যমত যত্নে বহু ভাগ্য মানিয়া ঐ সুরভীর দুগ্ধে দধি প্রস্তুত করিয়া পরদিন রাজাকে দিয়া আসিল। রাজা সেই উৎকৃষ্ট দধি খাইয়া ঐ গাভীলাভ মানসে আরও কৃতসংকল্প হইয়া তৎক্ষণাৎ সভায় ঐ গোপকে আনাইয়া কৃত্রিম ক্রোধে বলিলেন “ওরে দুষ্ট ব্রহ্মহত্যার ভয় নাই তোর দধি খাইয়া অবধি আমার কি মুখই চুলকাইতেছে কি দিয়া দধি করিলি ? আমাকে কি হত্যা করার ইচ্ছা করিয়াছিস ? এ দোষের তোর কি শাস্তিবিধান করি, তোর ঘরবাটী লুটিয়া আসুক” রাজার এই বাক্যে গোপ ভীত না হইয়া উত্তর করিল “ঠাকুর আমার দধি খাইয়া আপনার মুখ চুলকাইতেছে না কোন ঠক আসিয়া আমার সর্ব্বনাশের জন্য আমার সুরভীর নামে আপনার কাণ ভারী করিয়াছে তাই তার জন্যেই মুখ চুলকাইয়া উঠিয়াছে। গোপের এই উচিত বাক্যে সভায় হাস্য কোলাহল উঠিল এবং গুণদোষ বোদ্ধা রসময় রাজাও তাহার উপর পরম হৃষ্ট হইয়া পারিতোষিক দিয়া তাহাকে বিদায় করিলেন। তাঁহার সভার এইরূপ শত শত রহস্য গল্প প্রচলিত আছে।

এই কালের নদীয়ার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে নদীয়া সেই সময়ে আদৌ মুসলমান শাসন পরে ইংরাজ মুসলমান সম্মিলিত শাসনাধীন থাকিলেও উহা প্রত্যক্ষত কৃষ্ণনগরাধিপতিগণের শাসনাধীন ছিল এবং নদীয়াধিপতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র সর্ব্ববিষয়ে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে নদীয়ার শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেন এবং তাঁহার হিন্দুমুসলমান জাতি নির্ব্বিশেষে সমস্ত প্রজাই স্ব স্ব শাস্ত্রানুযায়ী বিচার লাভ করিয়া সন্তুষ্ট ভাবেই জীবন যাপন করিত। কচিৎ কখনও কোনও ঘটনা বিচার উপলক্ষে মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণের বা ইংরাজ শাসনকর্ত্তার গোচরে আসিত। নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্ধারিত রাজস্ব আদায় পাইলে উর্দ্ধতন কোন শাসনকর্ত্তাই অন্য কোন বিষয়েই কোন কথা উত্থাপন করিতেন না। এই সময়ে নদীয়া রাজ্যের বিস্তৃতি সুকবি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল অনুযায়ী *

* রাজ্যের উত্তর সীমা মুরসিদাবাদ।
পশ্চিমের সীমা গঙ্গা ভাগীরথী খাদ॥
দক্ষিণের সীমা গঙ্গাসাগরের ধার।
পূর্ব্বসীমা ধুল্যাপুর বড় গঙ্গা পার॥

অন্নদামঙ্গল।

এতদ্ব্যতীত ভাগীরথীর পশ্চিম পারে কুবাজপুর নামে এক বৃহৎ পরগণা অধিকৃত হইয়াছিল। এই রাজ্যের পরিমাণ ফল ৩৮৫০ বর্গক্রোশ ছিল। ইহা সুইজারল্যাণ্ড রাজ্য অপেক্ষাও কিঞ্চিৎ বৃহৎ ছিল। ইদানীং ইহার অধিকাংশ স্থান নদীয়া জেলার অন্তর্গত আছে; অবশিষ্ট অংশ চব্বিশ পরগণা, মুরশিদাবাদ, যশোহর এবং বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্ভূত হইয়াছে। এই অধিকারে ভাগীরথী জলধী (খড়িয়া), ইচ্ছামতী ভৈরব, রায়মঙ্গল, চূর্ণী, যমুনা এবং কতকগুলি ক্ষুদ্রনদী আছে। ইহার প্রধান নগর ও

উত্তরে মুরশিদাবাদের সীমা হইতে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের তটভূমি; পূর্ব্বে ধূলিয়াপুর হইতে পশ্চিমে ভাগিরথী খাদ তাঁহার বর্ণনা অনুযায়ী নদীয়ারাজের অধিকার ভূমি তখন চৌরাশী পরগণায় বিভক্ত ছিল। *

গ্রাম শান্তিপুর, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, হালিসহর, কলিকাতা, অগ্রদ্বীপ, চক্রদ্বীপ, কুশদ্বীপ, বহিরগাছি, শ্রীনগর, গোপালপুর, প্রভৃতি এবং প্রধান গঞ্জ শান্তিপুর, কলিকাতা, কৃষ্ণনগর, হাঁসখালি, নবদ্বীপ এবং চক্রদ্বীপ ছিল। এই জমিদারীর সমস্ত ভূমি সমতল। কলিকাতার দক্ষিণ ও পূর্ব্ব খাড়ি জুড়ি ও ধূলিয়াপুর প্রভৃতি কতিপয় পরগণা ব্যতীত অন্য কোন প্রদেশে বৃহৎ বন ছিল না।

ক্ষিতিশবংশাবলি-চরিত—১ম অধ্যায়।

* রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে, এই জমিদারীর অন্তর্ব্বর্ত্তী ৪৯ পরগণা এবং ৩৫ কিস্‌মথ অর্থাৎ পরগণার কিয়দংশ অধিকারে ছিল যথা অন্নদামঙ্গলে,—

পরগণার নাম,—নদীয়া, ওখড়া, পাঁচপত্তর, মানপুর, মুলগড়, বাগোয়ান, মহৎপুর, রায়পুর, সুলতানপুর, সুলতানবেদারপুর, উলা, সাহাপুর, ফতেপুর, উলপা, মারুপদহ, উমরপুর, গড়ু ইটবি, বায়সা, জাফরপুর, ভালুকা, সগুণা, মাটিয়ারি, এঙ্গুরিয়া, কাশিমপুর, গয়েশপুর, মহিষপুর, ইসলামপুর, খাড়ি, জুড়ি, মামুদপুর, এসমহিলপুর, শান্তিপুর, রাজপুর, নাটাগড়ি, আমিরনগর, মগুণ্ডা, আলমপুর, কুখরালি, বারঘাট, খাজরা, হলদহ, ইন্দুরখালি, খাজিশপুর, ভাৎসিংহপুর, বেলগাঁও, আবাঢ়শেলী, বুড়ন, খানপুর।

কিস্‌মথের নাম—হালিসহর, হাজরাখালি, পাইকান, মানপুর, কলিকাতা, আমিরাবাদ, আমিরপুর, খোশদহ, আনারপুর, বালিয়া,

এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড পরিভ্রমণ করিতে দ্বাদশ দিন অতিবাহিত হইত এবং ইহার আয় পঞ্চবিংশতি লক্ষমুদ্রার উপরও ছিল। * সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণের লিখিত বিবরণে আমরা দেখিতে পাই যে তদানীন্তন বাঙ্গলার নবাব সমগ্র বাঙ্গলা রাজস্বের যে জমা-কামেল-তুমারি প্রস্তুত করেন তাহাতে নদীয়া রাজ্য যাহা মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পিতা রঘুরামের সহিত বন্দোবস্ত হয় এবং পরে যাহা মুরশিদকুলীর পরবর্ত্তী নবাব তদীয় জামাতা সুজাখাঁর সময়ে সংশোধিত হয় তাহার জমার পরিমাণ ৫,৯৪,৮৪৬৲ টাকা নির্দ্ধারিত হয় ও তাহা চাকলা হুগলী, চাকলা যশোহর, চাকলা মুরশিদাবাদ, চাকলা ভূষণা ও চাকলা ঘোড়াঘাট, চাকলা বর্দ্ধমানের অধীন ৭৩ পরগণায় বিভক্ত দেখা যায়। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র সম্ভবতঃ পরে আর ১১ মৌজার স্বামীত্ব লাভ করেন।

এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে তখন ধান্য, নানাপ্রকার রবিশস্য, তূলা, গুড়, লঙ্কা প্রভৃতি উৎপন্ন হইত এবং ইহার শান্তিরক্ষার জন্য নদীয়াধিপতি,

---

পাইকহাটি, বালান্দা, কাথুলিয়া, মাইহাটি, জামিরা, পারধুলিয়াপুর, মুর্ব্বই, নামক ও নোন ধুলিয়াপুর, কুবেজপুর, জয়পুর, ভালুকা, বাগমারি, হোসেনপুর, হিলকি, তালা, কাটশালি, শোভনালি, পলাসি, বেহারোল, সহনন্দ, ভাবসিংহপুরহাট, আলমপুর, সিলেমপুর, আবাদহদ।

* Hollwell, in his work, quoted under Jafar Khan P. 202, says that he (Krishna Chandra) possessed a tract of country about twelve days journey and that he was taxed at 2 lacs p r annum, though his revenue receeded twenty five lacs of rupees—Kshitish Bangoabasi Charitam—

Translation by W. Per sch P. 69 (Index)

মহামান্য নবাবদরবারের নিকট জবাবদিহী ছিলেন; অর্থাৎ রাজ্যমধ্যে কোনও স্থলে লুটতরাজ বা চুরি ডাকাতী হইলে ফারমান প্রাপ্ত নদীয়ারাজ তাহাদের শাসনের জন্য সম্যক্ চেষ্টা করিতে ও অপহৃত দ্রব্য উদ্ধার পূর্ব্বক দ্রব্যস্বামীকে প্রত্যার্পণ করিতে বাধ্য ছিলেন। কাটোয়া হইতে বর্দ্ধমান ও তথা হইতে জগন্নাথের পথ কেবল রাজকীয় সৈন্য দ্বারা শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা ছিল। কথিত আছে তদানীন্তন নবাব মুরশিদ-কুলির সময়ে মহম্মদ জান কুঠারি নামক জনৈক সৈন্যাধ্যক্ষের উপর এই পথের শান্তিরক্ষার ভার ছিল। তাঁহার অগ্রপশ্চাতে বহু কুঠারধারী সৈন্য গমন করিত বলিয়া তিনি "কুঠারী" নামে অভিহিত হইতেন। তিনি চোর ডাকাত শাসন উদ্দেশে ধৃত অপরাধীগণকে জীবন্ত লম্বালম্বি দ্বিখণ্ডিত করিয়া পরে বৃক্ষ-শাখায় টাঙ্গাইয়া রাখিতেন। তিনি নদীয়ান্তর্গত পূর্ব্বস্থলীতে থানা বসাইয়া তথা হইতে নদীয়ার চোর ডাকাত শাসন করিতেন।

১৭২৫ খ্রীঃ মুরশিদ কুলীখাঁর মৃত্যু হইলে তাঁহার জামাতা সুজাউদ্দিন নবাবী লাভ করেন। ইনি সর্ব্ববিষয়ে রাজস্বের উন্নতিবিধান করেন এবং অধীনস্থ রাজা প্রজা সকলেরই মনোরঞ্জনে চেষ্টা করেন। মুরশিদ-কুলী যে বাঙ্গলার জমা-তুমার-কামেল করিয়া যান, ইনি তাহা সংশোধন করেন ও আদায়ের অনুপযুক্ত বহু টাকা রেয়াত দেন। তাঁহার সময়ে নদীয়ারাজ্যের যে টাকা কর ধার্য্য হয় তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে; ইহার উপর নানা প্রকারের আবওয়ার সৃষ্টি হওয়ায় মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় বহু রাজস্ব বাকী পড়িতে থাকে, কিন্তু উদারহৃদয় নবাব সুজার কৃপায় তাঁহাকে সুজার জীবদ্দশায় কারাগারের ক্লেশ ভোগ করিতে হয় নাই।

এই মহাপ্রাণ নবাবের রাজত্বকালে চারিজন ব্যক্তি রাজ্যমধ্যে প্রধান-রূপে গণ্য হয়েন। তাঁহাদের পরামর্শানুযায়ী সমস্ত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ

হইতে থাকে। প্রথম আলম খাঁন—ইনি হিন্দু এবং নায়েব দেওয়ান পদে নিযুক্ত হইয়া পরে "রাইরাইয়া" অর্থাৎ রাজাদের মধ্যে রাজা এই পদবী ভূষিত হয়েন। দ্বিতীয় ফতে চাঁদ—যিনি বাদশাহ কর্তৃক জগৎশেঠ পদবী লাভ করেন। তৃতীয় হাজী আহম্মদ সুজার প্রধান মন্ত্রী ও চতুর্থ হাজী আহম্মদের সহোদর ভ্রাতা আলিবর্দ্দী যিনি আজিমাবাদের শাসন কর্তৃত্বে নিযুক্ত ছিলেন। সুজা এই সকল উপযুক্ত সহকারীর সাহায্যে রাজ্য শাসন করিয়া ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করিলে তাঁহার অনুপযুক্ত অকর্ম্মণ্য বিলাসীপুত্র বঙ্গ মসনদে উপবিষ্ট হন। সরফরাজ বাল্যকাল হইতে উচ্ছৃঙ্খল ও দুর্নীতিপরায়ণ ছিলেন, এক্ষণে স্বয়ং সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া ঘোর ইন্দ্রিয়াশক্ত হইয়া উঠেন এবং পিতৃবন্ধু আলম চাঁদ, হাজী আহম্মদ, ফতে চাঁদ ও আলিবর্দ্দীকে সর্ব্বদা তাচ্ছিল্য করিতে থাকেন, এমন কি সময়ে সময়ে তাঁহাদিগকে অপমান করিতেও চেষ্টা পাইতেন। রাজ্যস্থ ক্ষমতাবান্ ব্যক্তি চতুষ্টয়ের সহিত সংঘর্ষ তাহার সর্ব্বনাশের কারণ হইয়া উঠে এবং জগৎশেঠের প্রতি নিদারুণ পাশব-ব্যবহার তাঁহার উচ্ছেদের কাল অগ্রবর্ত্তী করিয়া দেয়। কথিত আছে সরফরাজ এই সময়ে এতই উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠেন যে জগৎশেঠের ন্যায় একজন ক্ষমতাবান্ ধনীর অন্তঃপুরে দৃষ্টিপাত করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই।* কেহ কেহ অনুমান করেন জগৎশেঠের

---

* He (Fattauah Chand) had about this time married his youngest grandson named Set Mahatab Roy to a young creature of exquisite beauty aged abont 11 years. The fame of her beanty coming to the ears of the Saubat he burned with curiousity and lust for

সহিত অর্থসংক্রান্ত ব্যাপার লইয়াই সরফরাজের মনান্তর হয়। যে কারণেই হউক, রাজ্যপ্রাপ্তির অল্পদিবসের মধ্যেই সরফরাজ হাজী আহম্মদ জগৎশেঠ প্রভৃতি উচ্চ রাজকর্ম্মচারীবৃন্দের কোপনয়নে পতিত হন। হাজী আহম্মদ রাজমহালের ফৌজদার পরে পাটনার নবাব স্বীয় ভ্রাতা আলিবর্দ্দীকে সিংহাসনে বসাইয়া নিজের প্রতি সরফরাজের তাচ্ছিল্যভাবের প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন, এক্ষণে জগৎশেঠের সাহায্য পাইয়া ভ্রাতাকে মুরশিদাবাদ আক্রমণের উপদেশ প্রেরণ করেন। পথে গিরিয়া নামক স্থানে নবাব সৈন্যের সহিত আলিবর্দ্দীর বল পরীক্ষা হয় এবং এই যুদ্ধে সরফরাজ পরাজিত ও নিহত হইলে আলিবর্দ্দী আপনাকে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবেদার বলিয়া ঘোষণা করেন এবং দিল্লী হইতে ভ্রাতা হাজী আহম্মদ ও জগৎশেঠের সাহায্যে সনন্দ আনিয়া লন। রাজধানী অধিকৃত হইলেও সমগ্র দেশ তাঁহাকে প্রথমে সুবেদার বলিয়া স্বীকার করে নাই, এ কারণ তাঁহাকে অনেক যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। এই সকল যুদ্ধের পর দেশে শান্তিসংস্থাপিত হইতে না হইতেই, নাগপুর হইতে মারহাট্টারা আসিয়া বারম্বার পশ্চিমবঙ্গ লুটপাট করিতে থাকে। এই ঘটনার নাম বর্গীর হাঙ্গামা। এই হাঙ্গামা দেশে দশ বৎসর ছিল। এই সময়ে বর্দ্ধমানের মহারাজা সপরিবারে পলায়ন করিয়া তদানীন্তন নদীয়ার অন্তর্গত মুলাজোড়ের সন্নিহিত কাউগাছি গ্রাম গড়খাই করিয়া তন্মধ্যে প্রাসাদাদি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বাস করিতে থাকেন এবং পরে মূলাজোড় গ্রামখানি নদীয়াধিপতির নিকট

---

the possession of her and sending for Jagat Set demanded a sight of her Holwell's Interesting Historical events. Part I. Chap. II, p. 70

হইতে পত্তনী বন্দোবস্ত করিয়া লন।* কিন্তু নদীয়াও এ সময়ে ভাস্কর পণ্ডিতের অধীন মহারাষ্ট্রীয়গণের অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পায় নাই। নদীয়াধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র তাহাদের দৌরাত্ম্য হইতে তথা নবাবের উৎপীড়ন হইতে আত্মরক্ষার্থ নদীয়ান্তর্গত শিবনিবাস, কৃষ্ণনগর, কৃষ্ণগঞ্জ চূর্ণি তীরবর্ত্তী হরধাম ও আনন্দধাম নবদ্বীপ সন্নিহিত গঙ্গাবাস ও যাত্রাপুর প্রভৃতি বহুতর স্থান স্থাপনা করিয়া প্রাসাদাদি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সপরিবারে বাস করিতে থাকেন। এই সকল স্থান এখনও নদীয়ার মধ্যে ভদ্রপ্রধান-বিশিষ্ট স্থান বলিয়া পরিচিত, কিন্তু হায় রাজকীর্ত্তিমালা কোথাও সম্পূর্ণ ধ্বংসাবস্থায় পরিণত, কোথাও ধ্বংসোন্মুখ হইয়া জগতের নশ্বরতা প্রমাণ করিতেছে।

শিবনিবাস স্থাপনাসম্বন্ধে একটী মনোরম কিম্বদন্তী এতদঞ্চলে প্রচলিত আছে। কথিত আছে যে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র নসরত খাঁ নামক একজন দুর্দান্ত দস্যুকে তাঁহার রাজ্যমধ্যে উৎপাত করিতে দেখিয়া এবং চূর্ণীনদীর পূর্ব্বকূলে এক গভীর অরণ্যে তাহার ঘাটীর সন্ধান পাইয়া তাহাকে শাসনার্থ উপযুক্ত সজ্জায় আসিয়া, তথায় শিবির সন্নিবেশিত করেন; কেহ কেহ বলেন, ধনুর্বিদ্যা-পারদর্শী মহারাজা অতিশয় মৃগয়াপ্রিয় ছিলেন এবং মৃগয়ার্থই তিনি এই স্থানে শিবির সন্নিবেশ করেন। যে

---

* ঐ কাউগাছীর রাজভবনে মহারাজা তিলকচন্দ্র রায়বাহাদুরের শুভবিবাহ কার্য্য অতি সমারোহ পূর্ব্বক নির্ব্বাহ হয়। ফ্রেঞ্চ গবর্ণমেণ্টের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরি মহাশয় সেই মাঙ্গলিক কর্ম্মের অধ্যক্ষ হইয়া বিশেষরূপে নৃত্যগীতের আয়োজন করিয়া সভার শোভাবৃদ্ধি করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অনুরোধে ফরাসডাঙ্গা হইতে ৫০০ শত সৈন্য আসিয়া কয়েকদিবস রাজপুরী ও দুর্গরক্ষা করিয়াছিল।

কারণেই হউক, এই স্থানে শিবির সন্নিবেশ করায় পরদিন প্রাতঃকালে তিনি যখন নদীকূলে বসিয়া মুখপ্রক্ষালন করিতেছিলেন, তখন একটী সুবৃহৎ রোহিৎ মৎস্য জল হইতে লাফাইয়া তাঁহার সম্মুখে পতিত হয়। আন্দুলিয়ানিবাসী কৃপারাম রায় নামক জনৈক রাজজ্ঞাতি এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! এ স্থান অতি রমণীয়, রাজভোগ্য সামগ্রী আপনা হইতে আসিয়া আপনার নজররূপে উপস্থিত হইল। এখানে বাস করিলে আপনি সুখী হইবেন।" রাজাও তখন বর্গীর উপদ্রব হইতে আত্মরক্ষার্থ এইরূপ একটী নিরাপদ স্থান অনুসন্ধান করিতেছিলেন, এক্ষণে এই স্থানটী সকলে মনোনীত করিলে, তিনি উক্ত স্থানটীকে কঙ্কণাকারে নদীবেষ্টিত করিয়া স্বীয় দেওয়ান রঘুনন্দনের মতানুযায়ী এক সুন্দর পুরী নির্ম্মাণ করিলেন * ও আপনার বাসভবন ও দুইটী সুবৃহৎ শিবমন্দির স্থাপনা করিয়া

---

* এই অপূর্ব্ব পুরী সম্বন্ধে শতাধিক বর্ষ পূর্ব্ববর্ত্তী "মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্র" লেখক—শ্রীরাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাহার ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন মহানগরে মুদ্রাঙ্কিত পুস্তকের ৩০ পৃষ্ঠায় এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :—

"চারিদিকে যে নদী আছে সেই গড় হইল। দক্ষিণদিকের নদী বন্ধন করিয়া প্রধান পথ করিলেন এবং সৈন্যের থাকিবার স্থান করিলেন। বড় কামান দুই পার্শ্বে রাখিলেন হঠাৎ পুরমধ্যে শত্রু প্রবেশ করিতে না পারে, তৎপরে অতি উচ্চ অট্টালিকা, তাতে ঘড়ি, তদূর্দ্ধে ঘণ্টা, তার পর চারি দরজা মধ্যে সদাগরদিগের থাকনের স্থান এবং হাট নানাজাতীয় দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় হইবেক, তন্মধ্যে বিস্তারিত পথ কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া এক অট্টালিকা, তাতে নানাজাতীয় যন্ত্র লইয়া যন্ত্রীরা বাদ্যোদ্যম করিবেক পরে রাজবাটী প্রথম এক চতুঃসীমা দক্ষিণদ্বারী এক অট্টালিকা, তাতে ভৃত্যেরা

দুইটী দুর্জ্জয় শিবলিঙ্গ ও অপর একটী সুগঠিত সুবৃহৎ মন্দিরে রামসীতা স্থাপনা করিলেন এবং শিবের নামে গ্রামের শিবনিবাস

থাকিবেক। পরে এক চতুঃসীমা তাতে ঈশ্বরের আলয় অপূর্ব্ব রম্যস্থান সহস্র সহস্র লোকে দর্শন করিতে পারে। পরে একখান পুরী, তাতে মহারাজার বিরাজকরণের স্থান। চারিদিগে অট্টালিকা পরে অন্তঃপুর অতি বৃহৎ বাটী নানা স্থানে নানাপ্রকার অট্টালিকা। অন্তঃপুরের কিঞ্চিৎ দূরে এক পুষ্পোদ্যান চতুর্দ্দিকে প্রাচীর যাহা রাণী প্রভৃতি পুষ্পোদ্যানে গমন করিতে পারেন। পুষ্পোদ্যানে নানা জাতীয় পুষ্প তন্মধ্যস্থানে এক অট্টালিকা তাহাতে বসিয়া রাণী নৃত্যকীদিগের নৃত্য দর্শন করেন। এবং গীতবাদ্য শ্রবণ করেন। পশ্চিমদিগের যে পথ সেই পথ দিয়া কিঞ্চিৎ গমন করিলে এক ধর্ম্মশালা। সে স্থানে অন্ধ, আতুর, পঙ্গু এবং উদাসীন যে কেহ উপনীত হইবেক যার যে স্বেচ্ছা আহারের দ্রব্য পাইবেক। ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়া দ্রব্য রাখিলেন।

পূর্ব্বদিকে এক অপূর্ব্ব পুষ্পোদ্যান তার মধ্যস্থানে অট্টালিকা এবং নানা জাতীয় বৃক্ষ ও পুষ্প। এই পুষ্পোদ্যানের পর যাবতীয় মহারাজার জ্ঞাতি এবং কুটুম্বদিগের পৃথক পৃথক অট্টালিকাময়ী বাটী। প্রত্যেক বাটীতে দেবালয় এইরূপ অনেক প্রকার বাহুল্য করিয়া বাটী প্রস্তুত করিলেন। পরে পাত্র বাটী নির্ম্মাণ করাইয়া মহারাজকে সংবাদ দিলেন যে বাটী প্রস্তুত হইয়াছে। মহারাজা সপরিবারে নূতন বাটীতে আগমন করিয়া সকল পুরী দেখিয়া অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া পাত্রকে রাজপ্রাসাদ দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন অধ্যাপকদিগের স্থান করিয়াছ? পাত্র নিবেদন করিলেন মহারাজার যে পুষ্পের বাগান হইয়াছে তাহারই নিকট স্থান আছে আজ্ঞা করিলে সেই স্থানে প্রস্তুত করি। রাজা কহিলেন অতি শীঘ্র প্রস্তুত

নামকরণ করিলেন। * এই কঙ্কনাবেষ্টিত শিবনিবাসেই তিনি মহাসমারোহে বহুব্যয়ে "অগ্নিহোত্র ও বাজপেয়" যজ্ঞ † সম্পন্ন করেন এরূপ সমৃদ্ধ যজ্ঞ কলিতে এই শেষ। এই যুগল যজ্ঞ উপলক্ষে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, রাঢ়, গৌড়, কাশী, দ্রাবীড়, উৎকল, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থান হইতে সমাগত পণ্ডিতমণ্ডলী যজ্ঞান্তে তাঁহাকে "অগ্নিহোত্রী বাজপেয়ী" আখ্যা প্রদান করেন। এই উপাধি তিনি পরম গৌরবের মনে করিয়া তাঁহার বংশাবলীক্রমে ব্যবহারের আদেশ দেন। কথিত আছে এই কার্য্যেই শিবনিবাসে লক্ষ ব্রাহ্মণের পদধূলি সংগৃহীত হয় এবং তদুপলক্ষে নদীয়ান্তর্গত বাগ আঁচড়া হরিপুরের কাংশকারগণ লক্ষাধিক

করহ। রাজাজ্ঞানুসারে পৃথক পৃথক পাঠশালা প্রস্তুত করাইলেন সেই সকল পাঠশালায় প্রধান প্রধান পণ্ডিতেরা বসতি করিয়া অধ্যাপনা করাইতে লাগিলেন, এবং নানাদেশীয় গুণবান লোক আসিয়া গুণশিক্ষা করান এবং করে। রাজা শুভক্ষণে পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন আহ্লাদের সীমা নাই। পুরীর শিবনিবাস, নদীর নাম কঙ্কনা রাখিলেন।"

* এই শিবনিবাস তৎকালে কাশীতুল্য স্থান বলিয়া খ্যাত হয় যথা প্রবাদ বাক্য—

শিবনিবাসী তুল্য কাশী ধন্য নদী কঙ্কনা।
উপরে বাজে দেবঘড়ি নীচে বাজে ঠন্ঠনা॥
আঃ—রে—রঘুনন্দনা॥

এই সময়ে মহারাজার স্থাপিত বিগ্রহ ব্যতীত রাজ-আত্মীয়গণের দ্বারা বহু বিগ্রহ স্থাপন ও শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইহা সত্যই কাশীতুল্য শোভনীয় নগর হইয়াছিল।

† অগ্নিহোত্র যজ্ঞ।

গাড়ু অত্যল্প সময়ের মধ্যে প্রস্তুত করাইয়া দেয়। কালের ক্রীড়ায় এই সমৃদ্ধিশালী বিশাল নগরী এখন বনাকীর্ণ হইয়া ব্যাঘ্র শার্দ্দূলাদির নিবাসরূপে পরিণত হইয়াছে। প্রাসাদ ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং মন্দির কয়েকটীও সংস্কারাভাবে দিন দিন হতশ্রী হইতেছে * এখনও পর্য্যালোচনা

---

* এই মন্দির ও রাজপ্রাসাদাদি মহারাজা শিবচন্দ্রের পর হইতেই হীন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার লর্ড বিশপ্ হেবার সাহেব জলভ্রমণ করিতে বাহির হইয়া যখন এই স্থানে উপনীত হইয়াছিলেন তখনও তিনি এই প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দর্শন করিয়াছিলেন এবং এই স্থান সম্বন্ধে Hebber's journal Vol 1, P. 120 তে বহু কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী লিখিয়া গিয়াছেন ; তিনি প্রাসাদ ও মন্দিরের সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন ;—

The first temple which we visited was evidently the most modern being as the offiiciating Brahmin told us only fifty seven years old. In England we should have thought it at least 200 but in this climate a luilding soon assumes, without constant care all the venerable tokens of antiquity. It was very clean however and of good architecture, a square tower surmounted by a pyramidal roof with a high clouster of painted arches surrounding it externally to within ten feet of the springing of the vault. The cloister was also volted so that, as the Brahmin made me observe, with visible pride the whole roof was "Pucka" or brick and "belathee" or foreign. A very handsome gothic arch with an arabesque border opened on the

করিলে মন্দিরত্রয়ের ভিত্তিগাত্রে নিম্নলিখিত শ্লোক কয়টী পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে,—

প্রথম শিবমন্দিরে (১৬৭৬ শক বা ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত লিঙ্গমূর্ত্তি ৯ ফুট উচ্চ)—

---

south side and showed within the statue of Rama, seated on a lotus with a gilt but turnished umbrella over his head and his wife the earth born Seeta beside him A sort of bessert of rice, ghee, fruit sugarcandy &c. was ranged before them on what had the appearance of silver dishes.

From hence we went to two of the after temples which were both œtogonal with domes not unlike those of glass houses. They were both dedicated to Siva, (who Abdulla, according to his Mussalman notions, said was the same with Asan, and contained nothing but the symbol, of the deity of black marble.) The villagers asked if I would see the Raja's palace. On my asserting they led to a really noble Gothic gateway overgrown with beautiful broad leved ivy but in good preservation and decidedly handsomer though in prety much the same style with the "Holy gate" of the Kremtin in Moscow. Within this, which had apparently been the entrance into the city extended a broken but still in stately avenue of tall trees and on either side a wilderness of ruined buildings, overgrown with trees and brushwood, which reminned stonee of the baths of Caracalla and me of the upper part of the city of Coffa. I asked who had destroyed the palace and was

যো জাতঃ খলু ভারতে স্বরতরুজৈষ্ঠাদিদী শাংশকে
সেনানীমুখবাজিরাজবিলসৎ সংখ্যাবতীদম্পুরে।
কৃত্বা মন্দিরমিন্দু চুম্বিশিখরং ভূপালচূড়ামণিঃ
পৌত্র শ্রীযুত কৃষ্ণচন্দ্র নৃপতিঃ শম্ভুং সমস্থাপয়ৎ॥

দ্বিতীয় শিবমন্দিরে (১৬৮৪ শক বা ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত, লিঙ্গমূর্ত্তি ৭॥ ফুট উচ্চ)।

---

told Serajo Dowla an answer which (as it was evidently a Hindu ruin) fortunately suggested to me the name of the Raja Kissen Chand. On asking whether this had been his residence, one of the peasants answered in the affirmative, adding that the Raja's grand children yet lived hard by. By this I supposed he meant somewhere in the neighbourhood since nothing here promissed shelter to any beings but wild beasts.

Our guide meantime turned short to the right and led us into what were evidently the ruins of a very extensive palace. Some parts of it reminded me of Conway Castle and others of Bolton Abby. It had towers like the former though of less stately height and had also long and striking cloisters of Gothic arches but all overgrown with ivy and jungle roofless and desolate. Here however in a court whose gate way had still its old fol ing doors on their linges and the two boys whom we had seen on the beach came forward to meet as were annanced to us as the great grandsyns of Raja Kisen Chand and invited us very courteously in Persian to enter their father's dwelling.

যঃ সাক্ষাৎ কৃত শৈবমূর্ত্তি বসুধে শাংসকে সম্ভবাং সংখ্যাতঃ
ক্ষিতিদেব রাজপদভাক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রপ্রভুঃ।
তস্ত ক্ষৌণিপতে দ্বিতীয় মহিষী মূর্ত্তেব লক্ষ্মীস্বয়ম্
প্রাসাদপ্রবরে প্রাসাদসম্মুখং শম্ভুং সমস্থাপয়ৎ॥

শ্রীরামচন্দ্রের মন্দিরে (১৬৮৪ শক বা ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত, লিঙ্গ-মূর্ত্তি ৪ ফুট উচ্চ),—

দেবশ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ক্ষিতিপতিতিলকো ব্রহ্মরাজর্ষিবংশে
যোঽসৌ ভূকল্পশাখী শ্রুতি বসুবসুধে শাংশকে তুল্য সংখ্যে।
প্রেয়স্যাস্তস্মহিষ্যাঃ পরমস্কৃতিকৃতে জানকী লক্ষণাভ্যাং
প্রাসাদে প্রাদুরাসীৎ ত্রিজগদধিপতি শ্রীযুতরামচন্দ্রঃ॥

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে এই কালে বর্গীর বিভ্রাটে নদীয়ার ভাগীরথীকুল বিধ্বস্ত হইতেছিল। ইহার উপর আবার নবাবের রাজস্ব আদায়ের কঠোরতায় সমগ্র নদীয়ার প্রজাকুল ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার উপর পশ্চিম বঙ্গের জমীদারকুল বর্গীর আক্রমণে অত্যধিক পীড়িত হওয়ায় পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গের জমীদারগণের নিকট হইতে অসম্ভব রাজস্ব আদায় হইতেছিল এবং নদীয়া, রাজসাহী, দিনাজপুর প্রভৃতির রাজাগণের নিকট যুদ্ধের ও রাজ্যরক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ অর্থ সংস্থানের জন্য সবিশেষ উৎপীড়ন চলিতেছিল। নদীয়াধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র বার লক্ষ টাকা নজরানা না দিতে পারায় মুরশিদাবাদে নিজালয়ে নবাব আলিবর্দ্দীর আদেশে নজরবন্দী হইয়াছিলেন।* কথিত আছে কৃষ্ণচন্দ্রের পিতামহ রাজা রামজীবন এবং

---

* এ সম্বন্ধে সুকবি ভারতচন্দ্র নিজ চক্ষে দেখিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন,

মহাতব জঙ্গ তাঁরে ধরে লয়ে যায়।
নজরাণা ব'লে বার লক্ষ টাকা চায়॥